

📍 সম্পদহীন জনগণ আর সংসদ সদস্যদের সম্পদের পাহাড় : পৃষ্ঠা ৭
📍 শ্রমিকশ্রেণির মুক্তির সংগ্রামে কমরেড লেনিন আজও পথপ্রদর্শক : পৃষ্ঠা ১৬

📍 ফিলিস্তিনে গণহত্যা বন্ধ কর, ইসরায়েলি দখল মুক্ত কর : পৃষ্ঠা ১৬
📍 পুঁজিবাদী শোষণ-ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন হটাও, বাম গণতান্ত্রিক বিকল্প গড় : পৃষ্ঠা ১৬

রাজনীতি ও অর্থনীতিতে অশনিসংকেত ! দুর্নীতি-দুঃশাসন ও নির্বাচনী দুষ্কর্মের ফল জনগণ কত সহ্য করবে?

চোর ধরা না পড়লে বা ডাকাত প্রতিরোধ ভেঙে বেরিয়ে যেতে পারলেই চুরি, ডাকাতের মালামাল জায়েজ হয়ে যায় না। একইভাবে চালাকি, শয়তানি, চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র, জাল-জালিয়াতি কিংবা দুর্বৃত্তপনার মাধ্যমে কোন নীতি-আদর্শহীন কাজে সাফল্য আনতে পারলেই তার গুণকীর্তন করা যেমন চলে না তেমনি এর স্থায়িত্ব দিয়েও তার ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা পায় না। বরং এই স্থায়িত্ব এবং সফলতা মানবতা-সভ্যতার বিকাশকে দুর্বল করে, মনুষ্যত্বকে আঘাত করে। ফলাফলে নীতিনিষ্ঠতা গুরুত্বহীন হতে থাকে আর দুর্বৃত্তপনা ক্রমবর্ধমান হয়ে ওঠে। নীতিনিষ্ঠ রাজনীতি মার খেতে থাকে আর ভ্রষ্টপথে পরিচালিত নষ্ট রাজনীতি আসর জেঁকে বসে। গত ৫২ বছরে বাংলাদেশের রাজনীতি এ চেহেরাকেই স্পষ্ট করে চলেছে।

১২তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৭ জানুয়ারি ২০২৪ হয়ে গেল। চালাকি-জবরদস্তি, প্রতারণার নব কৌশলে অনুষ্ঠিত হয়েছে এ নির্বাচন। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ প্রথম জাতীয় নির্বাচন থেকে শুরু হওয়া অনিয়ম, জালিয়াতি ধাপে ধাপে নামতে নামতে এবার প্রহসনের শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছে। এতে নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত ও ব্যর্থ হয়েছে। জনগণ

নির্বাচনের প্রতি আস্থা হারিয়েছে। জনগণের ক্ষমতায়নের গণতন্ত্রকে ক্ষমতাহীন জনগণের অবাধ বিপ্লবে তাকিয়ে থাকার ম্যাজিক গণতন্ত্রে পরিণত করা হয়েছে। নির্বাচনকে শাসক দলের বাছাই করা ভোটাভুটির মহড়ায় লটারি জয়ের মতো জয়-পরাজয়ে পরিণত করা হয়েছে। অতীত ভোটসমূহের তিক্ত অভিজ্ঞতায় ভোট থেকে দূরে থাকা ভোটারদের মধ্যে ভোটের প্রতি আস্থা অগ্রহ সৃষ্টি করে ভোট কেন্দ্রে টানার লক্ষ্যে একই দলের আমি-ডামি, স্বতন্ত্র-জোটভুক্ত, অনুগত বিরোধী ইত্যাদি মিলে একটা হৈ-ছল্লোড়ের আয়োজন করা হয়েছিল। যদিও মূল প্রতিদ্বন্দ্বীকে মেরেধরে কৌশলে বাইরে রাখা হয়েছিল।

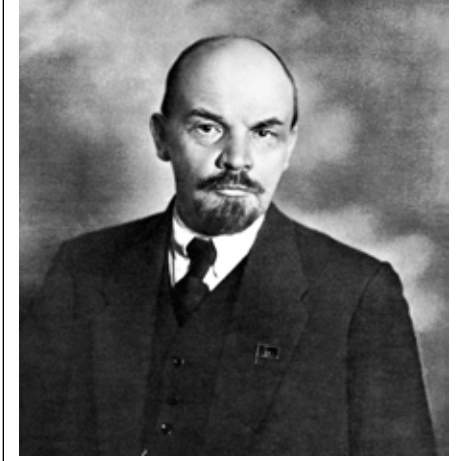
এত কিছু পরও বাস্তব ভোট ২০ শতাংশ এর বেশি হবে না। ১৬ জানুয়ারি প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, 'ভোটের দিন সাড়ে ১২টার দিকে নির্বাচন কমিশন সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন সারা দেশে দুপুর ১২টা ১০ মিনিট পর্যন্ত গড়ে ১৮ শতাংশ ভোট পড়েছে। বেলা সাড়ে ৩টার দিকে দ্বিতীয় দফা ব্রিফিংয়ে সচিব জানান, বেলা ৩টা পর্যন্ত ২৬.৩৭ শতাংশ ভোট পড়েছে। তবে এই হিসাব কিছুটা হেরফের হতে পারে। কারণ সব

জায়গার তথ্য পাওয়া যায়নি। বিকেল ৫টার পর সংবাদ সম্মেলনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল প্রথমে বলেন, ২৮ শতাংশের মতো ভোট পড়েছে। পাশ থেকে তাকে একজন বলেন, এই হার ৪০ শতাংশ। তখন সিইসি বলেন ৪০ শতাংশ। তারপরও এটা ড্যাশবোর্ডে শতভাগ তথ্য আসেনি। ৪০ শতাংশ যেটা এসেছে এখন পর্যন্ত এটা নির্ভরযোগ্য। তবে এটা নিশ্চিত নয়।' আর ভোট শেষে তাদের শেষ ঘোষণায় ৪১.৮ শতাংশ দেখানো হয়েছে।

বাসদ এবং বামপন্থি শক্তিসমূহসহ নির্বাচন বর্জন আন্দোলনকারীদের পক্ষে জনসমর্থন দিন দিন ভারী হচ্ছিল। নীরব এবং সরব সমর্থন পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছিল। সরকার তড়িঘড়ি করে সাংসদদের শপথ অনুষ্ঠিত করে নতুনভাবে পার্লামেন্ট ও মন্ত্রিসভা সাজিয়েছে। যদিও চোরের মনে পুলিশ পুলিশভাব দূরীভূত হচ্ছে না।

আমরা জানি নির্বাচন হলেই গণশাসন হয় না। একই নির্বাচন গণতন্ত্রের তথা গণতান্ত্রিক শাসন-প্রশাসনের পথ প্রশস্ত করতে পারে আবার স্বৈরতান্ত্রিক বা ফ্যাসিবাদী শাসন-শোষণ নিপীড়নের শক্তি ভিত্তিও মজবুত করে তুলতে এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

লেনিনের শিক্ষা : মানবমুক্তির সংগ্রামে কেন জরুরি?



[বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ও রুশ বিপ্লবের রূপকার কমরেড লেনিনের মৃত্যুশতবার্ষিকী এবছর। সে উপলক্ষে রুশ বিপ্লবের শতবর্ষে বাসদ প্রকাশিত শতবর্ষে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ইতিহাস অর্জন ও শিক্ষা বইটির নির্বাচিত অংশ ভ্যানগার্ড-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হবে। এই সংখ্যায় ছাপা হলো প্রথম কিস্তি।]

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

ভোট বর্জনের গণরায় মেনে নিয়ে 'ডামি' নির্বাচন বাতিল কর

সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচন দাও,
নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কার কর



বাম গণতান্ত্রিক জোট

বাম গণতান্ত্রিক জোট দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে 'প্রহসনের নির্বাচন' বর্জন করায় জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। পাশাপাশি

ভোট বর্জনের গণরায় মেনে ডামি নির্বাচন বাতিল করে অবিলম্বে নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচন দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

৮ জানুয়ারি '২৪ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে
এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

নির্বাচনী তামাশায় কী পেল জনগণ?

একতরফা নির্বাচনের পর পুনরায় একদলীয় শাসন দেখছে বাংলাদেশ। ইতিপূর্বে '৭২-৭৫ সময়কালে তৎকালীন 'বাকশাল' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একবার একদলীয় শাসন দেখেছিল। ক্ষমতার উৎস জনগণ এই কথা বুজিয়েছিল। একসময় শ্লোগান হিসেবে নিয়ে এসেছিল। রাষ্ট্র শাসিত হবে ঐশ্বরিক ক্ষমতা না জনগণের ইচ্ছার দ্বারা, ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে রাজা দেশ শাসন করবে নাকি জনগণের প্রতিনিধিরা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে এই বিতর্কের ফয়সালা হয়েছিল ফরাসি বিপ্লবে। সামন্ত সমাজ ভেঙে সমস্ত ক্ষমতা এক কেন্দ্রে রেখে রাজতান্ত্রিক স্বৈরাচারের পরিবর্তে ক্ষমতার বিভাজন তত্ত্ব নিয়ে এসেছিলেন মতেস্কু। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভা, বিচার বিভাগ আর প্রশাসন রাষ্ট্রের এই তিনটি অঙ্গ যদি স্বাধীন এবং পরস্পরের পরিপূরক থাকে তবেই ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা হতে পারে। একটি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ তিন অঙ্গের অন্যতম হলো সংসদ বা আইন সভা। আইনসভায় আইন ও নীতি প্রণীত হবে এবং সেই আইন দ্বারা দেশ প্রশাসনের মাধ্যমে পরিচালিত হবে এই ছিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার শর্ত। কাজেই আইনসভার সদস্য নির্বাচন দেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে সংসদ সদস্য নির্বাচনের মহাযজ্ঞই হলো জাতীয় সংসদ নির্বাচন।

গত ৭ জানুয়ারি ২০২৪ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ

নির্বাচন শেষ হয়েছে, কিন্তু নির্বাচন যে বিতর্কের জন্ম দিয়ে গেল তা সহজেই শেষ হবে না। ক্ষমতাসীনরা বলছেন সকল ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে শান্তিপূর্ণ এবং অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচনের দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন তারা, আর জনগণ দেখেছে, কীভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সকল অঙ্গকে কাজে লাগিয়ে অবাধে সুনিয়ন্ত্রিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে যা নির্বাচন থেকে গণতন্ত্রকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। নির্বাচনকে বলা হতো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অঙ্গ কিন্তু মৃতপ্রায় গণতন্ত্র আর বিকলাঙ্গ নির্বাচন দেখেছে মানুষ। সুষ্ঠু, অবাধ নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক কতদিন চলবে তা জানা নেই। তবে আগামী দিনে নির্বাচনের প্রশ্ন এলে ২০২৪ সালের নির্বাচন একটি বিশেষ গুরুত্ব নিয়েই আলোচিত হবে।

এবারের নির্বাচন ছিল অনেক দিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ। ক্ষমতাসীন সরকার চাইলে যে সর্বমহলের বিরোধিতা ও শত প্রতিকূলতার মধ্যেও এবং গণদাবিকে উপেক্ষা করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে পারে তার সর্বশেষ নজির এবারের নির্বাচন। এর আগে বর্জন প্রতিরোধ সত্ত্বেও ১৯৮৬, ১৯৮৮ এবং ১৯৯৬ এর ১৫ ফেব্রুয়ারি এবং ২০১৪ সালে নির্বাচন হয়েছিল। কিন্তু এবারের নির্বাচন সেসবের তুলনায় অনেকখানি আলাদা। এবার একই দলের নেতা কর্মীরা ভাগ হয়ে পাল্টা প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচন করেছেন, নিজের দলের
এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

রাজনীতি ও অর্থনীতিতে অশনিসংকেত !

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পারে। জার্মানির হিটলার ও ইতালির মুসোলিনির ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। গণতান্ত্রিক নির্বাচন বলতে সাধারণত : বুঝানো হয় ক্ষমতার মালিক জনগণের মত ও পথের নির্বাচন। কোন মতে, কোন পথে দেশ পরিচালিত হবে অর্থাৎ, দেশের শিক্ষা-স্বাস্থ্য, শিল্প-কৃষি, বাণিজ্য, আইন-বিচার, শাসন-প্রশাসন ইত্যাদি কোন নীতি পদ্ধতিতে চলবে এবং এসব বিষয়ে জনগণের সর্বোচ্চ ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থ বাস্তবায়নের যোগ্য জনপ্রতিনিধি তথা জনসেবক কারা হবে তার নির্বাচন। কারণ ১৭-১৮ কোটি মানুষ একজায়গায় বসে দেশ চালাতে পারে না। তাই তাদের মতামতে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দেশ পরিচালিত হবে। এর জন্য শুধু ভোটের দিন বা তফসিল পরবর্তী সময় যথেষ্ট সময় নয়। ৫ বছর পর পর যদি নির্বাচন হয়, তাহলে এ পুরো সময়জুড়েই এ বিষয় নিয়ে, ব্যাপক গণআয়তনে তর্ক-বিতর্ক, আলাপ-আলোচনা, পর্যালোচনা ইত্যাদি প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে আয়োজন হতে হবে। যাতে শাসন-প্রশাসন ব্যবস্থা, আইনকানুন-নীতিমালা, বিধিবিধান কেমন হবে তার চিত্র জনগণের সামনে আকাশের তারা দেখার মতো নয়, হাতের কাছের জমি আর ফসলের মতো নিকটবর্তী হয়ে ওঠে। মানুষের মাঝে যুক্তিবাদী মন তৈরি হয়। যারা সেবক হতে চায় তাদের ত্যাগ-তিতীক্ষা, জবাবদিহিতা ও প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতাসহ একাত্ম নিবেদিত ভাব পরিলক্ষিত হয়। এতে জনগণের রাজনৈতিক চেতনা, যুক্তিবাদীমন ও বিচার ক্ষমতা তৈরি হয়। অন্যদিকে রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতা কর্মীদের মধ্যে দেশ, সমাজ ও জনগণকে বুঝতে জানতে ও চিনতে সহজ হয়। দেশপ্রেম, মানবহিতৈষী মনোভাব ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী মন মানসিকতা গড়ে ওঠে। গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল রাজনৈতিক-সংস্কৃতিবোধ তৈরি হয়। অন্যথায় জনগণ যত পিছিয়ে থাকে বা পিছিয়ে রাখা হয়, রাজনীতি তত প্রতিক্রিয়াশীল গণবিচ্ছিন্ন সুবিধাবাদে পরিণত হয়। নেতাকর্মীদের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা, ব্যক্তিসুবিধাবাদ ও ভোগবাদী প্রবণতা মাথা চাড়া দেয়।

আর একটা নির্বাচন কোন পরিবেশে কী পরিস্থিতি, কী আয়োজনে জনগণের কাছে কতটা আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাও বিবেচ্য বিষয়। তবে গুরুত্বপূর্ণ হলো দেশের আইনকানুন, বিধিবিধান, প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, প্রতিরক্ষা বাহিনী, বিচার ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয়-স্বায়ত্তশাসিত, আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ, অর্থব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, রাজনৈতিক-সামাজিক, সংস্কৃতি ইত্যাদি যদি গণতান্ত্রিক না হয়, তাহলে শুধুমাত্র নির্বাচন হলেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পায় না।

আমরা দেখে আসছি এবং দেখছি কী? এবারও যারা কথিত গণপ্রতিনিধি হওয়ার মাঠে নেমেছিলেন তাদের হলফনামায় দেখা গেছে তারা রাজনীতিকে কত বড় ব্যবসায় পরিণত করেছেন। বিগত ৫-১০, ১৫ বছরে জনপ্রতিনিধিদের সুবাদে এদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দ্বিগুণ থেকে ৪০০ গুণ, ২০০০% থেকে ২৫০০% বেড়েছে। একজনও নেই যার সম্পদ কমেছে। অথচ যে করোনা ও ইউক্রেন যুদ্ধের দোহাই দিয়ে তারা জনজীবনে আর্থিক সংকট ও দুর্দশার পক্ষে সাফাই গায়, সেই একই সময়ে সাড়ে তিন কোটি মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে নেমে গেছে। অথচ এই সকল বুর্জোয়া রাজনৈতিক ব্যবসায়ীরা কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। ব্যবসায়ীরা নির্বাচনী রাজনীতিতে এসে ভিড় জমিয়েছে। কারণ রাজনৈতিক ব্যবসার মুনাফা এখন সর্বোচ্চ। এই অবস্থা দেখে এখন খেলা, অভিনয়সহ নানা ক্ষেত্র থেকেও লোকজন নির্বাচনে প্রার্থী হতে উৎসাহী হয়ে ওঠছে, আর ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে এদের

জনপ্রিয়তাকে শাসকশ্রেণিভুক্ত দল পুঁজি করছে, তারাও রাজনীতিতে স্বল্প সময়ে বিত্তবান বনে যাওয়ার গোমর বুঝে ফেলেছে। তাই শাসকশ্রেণির বুর্জোয়া দলের নেতৃত্ব নিরলঙ্ঘ্যভাবে রাজনীতিকে খেলা বানিয়েছে। দেশসেবা ও জনসেবার এক মহান পেশাগত দায়িত্ব কর্তব্য পালনকে তারা খেলা বলছে। রাজনীতিকে যারা খেলা বানায় তারা যে রংতামাশা প্রদর্শনের বাজিকরে পরিণত হয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই খেলায় জনগণকে ফুটবল বানিয়ে বুর্জোয়া খেলোয়াড়রা এ পা থেকে ও পায়ে ফেলে তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের গোল দেবে, এ ছাড়া আর কী মানে হবে? তারা এই খেলার মাঠকে সমতল ভূমি বানানোর দাবি করে অর্থাৎ তারা সমানে সমানে খেলা দেখাবে আর জনগণ গ্যালারিতে বসে খেলার তামাসা দেখবে। এই বোধের রাজনীতির কাছে আর কী আশা করা যেতে পারে?

আর একটা বাজে কথা চালু করা হয়েছে যে, রাজনীতিতে নাকি শেষ কথা নাই। অর্থাৎ, যখন যেমন তখন তেমন সুযোগ গ্রহণ। নীতিগত অবস্থান থেকে অনৈতিক অবস্থানে যাওয়া যায় না, এখানে শেষ কথা আছে। প্রগতিশীল অবস্থান থেকে প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থানে যাওয়া যায় না, এখানে শেষ কথা আছে। সমাজতন্ত্রের কথা বলে পুঁজিবাদের পথে চলা যায় না, এখানে শেষ কথা আছে। সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ সাপেক্ষে কাজ করা বিজ্ঞানসম্মত, কিন্তু সেটা যখন যেমন সুবিধা তেমন গ্রহণ করা বুঝায় না। আর কৌশলের অনেক পরিবর্তন ঘটতে পারে কিন্তু নীতিহীন কৌশল গ্রহণীয় হতে পারে না—এটা সুবিধাবাদ। এখানেও শেষ কথা আছে। এটার সঠিক উপলব্ধির ঘাটতি থেকে বুর্জোয়ারা ‘পাকা’ বাম বেছে নেয় আর বহুদিনের সংগ্রামী ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও অনেক বাম দল ও ব্যক্তি বুর্জোয়াদের তরীতে উঠে ভরাডুবির শিকার হন।

রাজনীতি যখন দুর্নীতিগ্রস্ত হয় তখন দুর্নীতি সমাজের রক্তে রক্তে ছড়িয়ে পড়ে। রাজনৈতিক শাসন ক্ষমতা যখন স্বৈরতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদী হয় তখন সমাজের সর্বস্তরে কর্তৃত্ববাদী মানসিকতা ও আচার আচরণ ব্যাপকতা লাভ করে। রাজনীতি যখন পুঁজিবাদী নীতিতে পরিচালিত হয় তখন সমাজ মানসে ভোগবাদী উন্মত্ততা সৃষ্টি হয়। রাজনীতি থেকে যখন নীতি বিসর্জিত হয় তখন সংস্কৃতি পথ হারায়, বিপথগামী হয়। যুবক, তরুণসমাজ নীতিভ্রষ্ট পথে পা বাড়ায়। বুর্জোয়া দলগুলির অনুগামী অনুসারীরা দীর্ঘদিন ধরে কার তুলনায় কে কত বেশি খারাপ এ নিয়ে বাচাল বিতর্ক করে এসেছে। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের বদলে তর্কের খাতিরে তর্কের আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক চর্চা করে চলেছে। এই সব দলগুলি গড়ে উঠার ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগত পার্থক্য থাকলেও নীতিগত বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। সবাই মুক্তবাজারি পুঁজিবাদের নিউ-লিবারেল অর্থনীতির ধ্বংসধারী। ফলে সমস্যার মূল উদ্ঘাটন বা মূল উৎপাটন তারা করবে না বরং জিইয়ে রাখবে। কার্পেটের তলায় ময়লা রেখে উপরে ঝাড় দিতে থাকবে। তাই করছে তারা। এদের প্রতিযোগিতা—কে কার চেয়ে বেশি অন্যের ত্রুটি ধরে নিজের ত্রুটি আড়াল করতে পারবে। ভালোর চেয়ে আরও ভালোর পথে না হেটে অন্যের খারাপের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে নিজেদের অধিক খারাপ ছবিকে আড়াল কিংবা যুক্তিসিদ্ধ করার বাচাল বাগবিতণ্ডাকে প্রচার মাধ্যমের মুখ্য বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে।

পক্ষ মানুষ যেমন ক্র্যাচে ভর দিয়ে চলে তেমন আমাদের শাসক দলসহ বুর্জোয়াগোষ্ঠী আঞ্চলিক সাম্রাজ্যবাদ কিংবা আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদসহ বিদেশি বড় কোন শক্তির উপর নির্ভর করে চলার উপায় বেছে নিয়েছে। জনশোষণের উপর শাসন, দুর্নীতির উপর উন্নয়ন, ধোকার উপর প্রতিশ্রুতি, কুরুচিপূর্ণ নিচু সংস্কৃতি চর্চাকে জনগণ খায় বলে জনখাদ্য বানানো, আইনের নামে কালোআইন,

মামলার নামে বেআইনি গায়েবি মামলা, এক মামলায় ১০৪ বার প্রতিবেদন পেছায় আবার ভোটের আগে বিরোধীদেরকে শায়েস্তার জন্য ১০-১২ বছরের পুরনো ৪ মামলায় ১ দিনে ১২৯ জনের সাজা হয়ে যায়, (প্রথম আলো ২১ ডিসেম্বর '২৩), হাইকোর্টের ভাষায় দুর্বল অভিযুক্তকে ডাডাবেড়ি পরানোর অসভ্যতা, বিদেশি বড় শক্তির ছোট প্রতিনিধিদের কাছে ধরনা দেয়ার প্রতিযোগিতা হরদম চলছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনতা ও ভারতের উদ্দেশ্য এক ছিল না। '৭১ সালে ভারত তার প্রধান আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে শক্তিশীন করতে চেয়েছে, আমরা পাকিস্তানি উপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির জন্য যুদ্ধে ভারতের সাহায্য ও আশ্রয় নিয়েছি। ভারত এবং আমাদের উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন হলেও উভয়ের একই শত্রু ছিল পাকিস্তানি শাসকশ্রেণি। ফলে, ভারত আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য দিয়েছে তাদের স্বার্থে, আমরা তা নিয়েছি আমাদের স্বার্থে। এ সত্য ভুলিয়ে দিয়ে পারস্পরিক সমমর্যাদা ও সমস্বার্থের হানি ঘটিয়ে শাসকশ্রেণির দলসমূহের নতজানু অবস্থান জনযুদ্ধে অর্জিত একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ ও জাতির জন্য অবমাননাকর। ভারত একটা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র হিসাবে তার আঞ্চলিক আধিপত্য বিস্তারের আমরা বিরোধী কিন্তু ভারতীয় শাসকদের হিন্দুত্ববাদী-সাম্প্রদায়িকতার বিপরীতে মুসলমানিভুবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির ভারত বিরোধীতাও আমাদের সুমহান মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহ্য ও সংগ্রামী চেতনা হতে পারে না। আমরা সাম্প্রদায়িকতাকে সেকুলার গণতান্ত্রিক চেতনা দিয়ে মোকাবিলা করবো। ভারতের জনগণের সেকুলার সংগ্রামের সাথে সংহতি রক্ষা করবো। একইভাবে ভারত ঠেকাতে কিংবা গদি দখলে আনতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাম্রাজ্যবাদী অভিলাষ বা চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের গুটি আমরা হতে পারি না। আমেরিকার জনগণের ৯৯ ভাগ বনাম ১ ভাগ মানুষের সংগ্রাম, সাড়া জাগানো বর্ণবাদবিরোধী সংগ্রামের সাথে আমরা একাত্ম থাকবো। সংবিধানের ২৫(গ) ধারা মতে ‘সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণ বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম সমর্থন...’ করে যাবে।

মুক্তির জন্য যুদ্ধে অর্জিত দেশ ৫২ বছরেও কেন গণতান্ত্রিক শাসন দূরে থাক, একটা সূষ্ঠ গ্রহণযোগ্য নির্বাচন শাসক শ্রেণি করতে পারছে না, কেন দেশের সাধারণ মানুষ দেশে তাদের সুন্দর ভবিষ্যত দেখতে পায় না, সোয়া কোটির উপর মানুষ জায়গা-জমি বিক্রি করে, অনেকে সর্বস্ব হারিয়ে সাগরে-জঙ্গলে প্রাণ খুইয়ে বিদেশে পাড়ি জমালায়?

শিক্ষার্থীরা কোনো উপায় থাকলে বিদেশে শুধু পড়তে যায় না, স্থায়ী হতে চায়, কেন মানুষ অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্য বিদেশে ছোট্ট দেশে অত্যন্ত নামি-দামি প্রাইভেট হাসপাতালে একটা শিশুকে খৎনা করার জন্য অজ্ঞান করা হলে তার আর জ্ঞান ফেরে না। অরাজকতার বহু খবর প্রতিনিয়তই পাওয়া যায়। কেন রাষ্ট্রের তথা জনগণের সম্পদ নামমাত্র মূল্যে ব্যক্তি মালিকদের হাতে তুলে দিতে হয়? কেন বিদেশে টাকা পাচার, ব্যাংক ঋণের নামে টাকা আত্মসাৎ ঠেকানো যায় না? কেন ক্ষমতার রাজনীতি সর্বোচ্চ ব্যবসা হিসাবে পরিগণিত হয় এবং পার্লামেন্ট ব্যবসায়ীদের ক্লাবে রূপান্তরিত হয়? কেন ভোট আসলে গদি রক্ষা ও গদি দখলের লড়াই চরদখলের চেহারা নেয়? কেন নির্বাচনের আগে পরে সম্ভ্রাস সহিংসতায় বহু মানুষ আহত নিহত হয়? এ সবের মূলে রয়েছে পুঁজিবাদের পথে বুর্জোয়া শ্রেণির নেতৃত্বে দেশ পরিচালনা। মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনা সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায় বিচার, জনগণের ক্ষমতায়নের

গণতন্ত্র, শোষণমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সমাজতন্ত্র, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারমুক্ত ধর্মনিরপেক্ষতা, স্বাধীন জাতীয় বিকাশের জাতীয়তাবাদ এ সবই আজ বিসর্জিত। গণতন্ত্রের বদলে সামরিক কিংবা বেসামরিক স্বৈরশাসন, পরিবারতন্ত্র-লুটপাটতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্রের বাইরে দেশে কখনও গণতান্ত্রিক শাসন ছিল না। গণতন্ত্র মাঝে মধ্যে উকি দিলেও তার আসন প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। সমাজতন্ত্রের বদলে চলছে মুক্তবাজারি পুঁজিবাদ। একে আড়াল করতে এক সময়ের শাসকরা সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা সামাজিক সুবিচার করেছিল, আর বর্তমান শাসকগোষ্ঠী সমাজতান্ত্রিক অঙ্গীকার ভুলিয়ে দিতে কথিত ‘স্মার্ট’ বাংলাদেশের বুলি আওড়িয়ে ধোকা দিচ্ছে।

তাই আজ জনগণের ভাগ্য ফেরাতে হলে, মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে পুঁজিবাদের পথ এবং বুর্জোয়া রাজনীতির বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। নীতিভ্রষ্ট বামপন্থিদের অবস্থা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শোষণ লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে সারা দুনিয়ায় আজ আওয়াজ উঠেছে। সমাজ বিকাশের প্রয়োজনে পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা আজ নিঃশেষিত। শোষণমূলক ব্যবস্থা বহাল রেখে আমেরিকা থেকে ভারত-বাংলাদেশ কোথাও সনাতন অর্থে বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আমেরিকার ক্যাপিটাল হিল দখল, ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হিন্দুত্ববাদী গণতন্ত্র আর বাংলাদেশের ভোট তামাশা, বহু দেশে সামরিক শাসন ইত্যাদি সেই সত্যকেই আজ তুলে ধরে। তাই আজ বলিষ্ঠ শপথে মুক্তির মন্ত্র সমাজতন্ত্রের ঝাড়া উড়িয়ে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে এগোতে হবে। সমাজতন্ত্র যে উন্নত সভ্যতা গড়ে তুলেছিল এবং সোভিয়েতসহ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন যে সমাজতন্ত্রের পতন নয়, তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তুলে ধরে জনমনে বিভ্রান্তি ও হতাশার ঘোর কাটিয়ে সকল বাম প্রগতিশীল শক্তির ঐক্যবদ্ধ গণসংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। বিপ্লবী দল হিসাবে বাসদকে মিলিত মিছিলে থেকে অগ্রসর নিশানা নিয়ে এগোতে হবে। ইতিহাস নির্ধারিত সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম ও শোষণমুক্ত সমাজ নির্মাণের বিজয় অনিবার্য।

চলন্ত ট্রেনে কিশোরী ধর্মণের দৃষ্টান্তমূলক শান্তি দাবি

সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি প্রকৌশলী শম্পা বসু ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. দিলরুবা নুরী এক বিবৃতিতে ১৮ জানুয়ারি '২৪ লালমনিরহাট অভিমুখী লালমনি এক্সপ্রেসের অ্যাটেনডেন্ট কর্তৃক ১৪ বছরের কিশোরী ধর্মণের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও দৃষ্টান্তমূলক বিচারের এর দাবি জানিয়েছেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, নারী নির্যাতন-ধর্মণ দেশে একটি স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। যাতায়াতের জন্য ট্রেনকে অনেক বেশি নিরাপদ ভাবা হয়। রাতের যাতায়াতে নারীরা ট্রেনকে নিরাপদ মনে করে। কিন্তু ১৬ জানুয়ারি আন্তঃনগর লালমনি এক্সপ্রেস ট্রেনে ১৪ বছরের কিশোরী ভুলবশত উঠে পড়লে বগির অ্যাটেনডেন্ট তাকে খালি সিটে বসিয়ে লালমনিরহাট নিয়ে আসে এবং ভোরবেলা খালি কেবিনে নিয়ে ধর্মণ করে। নিরাপত্তারক্ষীরা কিশোরীর কান্নার শব্দ শুনে তাকে উদ্ধার করে ও অ্যাটেনডেন্টকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গণপরিবহনে এর আগে নারীরা গণধর্মণের শিকার হয়েছে। ট্রেনে ধর্মণের এই ঘটনা গণপরিবহন ব্যবহারে নারীর নিরাপত্তাকে আরও বেশি প্রশ্নবিদ্ধ করে দিল। অবিলম্বে ধর্মণের বিচার এবং গণপরিবহনে নারীর নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ।

শিক্ষা, গণতন্ত্র-মনুষ্যত্ব রক্ষার সংগ্রামের ৪ দশক

বহরব্যাপী আয়োজনের উদ্বোধনী
ছাত্র সমাবেশ

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠার ৪ দশক পূর্তি উপলক্ষে বহরব্যাপী আয়োজনের উদ্বোধনী ছাত্র সমাবেশ ২১ জানুয়ারি '২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরায়ে বাংলার পাদদেশে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুক্তা বাউড় এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিনের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি সুমিত্রা মরিয়ম, সাংগঠনিক সম্পাদক সম্পাদক সুহাইল আহমেদ শুভ, দপ্তর সম্পাদক অনিক কুমার দাস, অর্থ সম্পাদক সুলতানা আক্তার, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক হারুন-অর-রশিদ। কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন উড়িয়ে ৪ দশক পূর্তির বহরব্যাপী কর্মসূচি উদ্বোধন করেন।

সমাবেশে কমরেড ফিরোজ বলেন, ২১ জানুয়ারি ছাত্র সমাজের অগ্রবর্তী চিন্তার পথিকৃৎ সংগঠন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার চার দশক পূর্তি হচ্ছে। ৪০ বছর পূর্বে সর্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক-সেকুলার, বৈষম্যহীন একই পদ্ধতির গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সংগ্রামের প্রত্যয় ঘোষণা করে যাত্রা শুরু করে। নানা চড়াই উতরাই পেরিয়ে সংগ্রামমুখর ৪০ বছর অতিক্রম করেছে আমাদের প্রাণপ্রিয় এই সংগঠন। এ সংগ্রামে যারা সহযাত্রী ছিলেন এবং যারা নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন, সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবসের শুভলগ্নে সকলকে সংগ্রামী শুভেচ্ছা ও বিপ্লবী অভিনন্দন।

আমরা যখন সংগঠনের চল্লিশ বছর পালন করছি তখন দেশের মানুষ এক চরম সংকটে। ৭ জানুয়ারি একতরফা 'ডামি' নির্বাচনের মাধ্যমে পুনরায় ক্ষমতার নবায়ন করে আওয়ামী ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন দীর্ঘায়িত করতে যাচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে মানুষ দিশেহারা। ১২ কোটি মানুষ পুষ্টির খাবার থেকে বঞ্চিত। অর্থনৈতিক সংকট চরমে, রিজার্ভ ক্রমাগত কমছে। বেকারত্বের অভিধানে ছাত্র যুবকদের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে পড়েছে। সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে দলীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে। বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম, খুন, নারী-শিশু নির্যাতন, টাকা পাচার, সীমাহীন লুটপাট, ব্যাংক লোপাট ও দুর্নীতি চলছে অবাধে। পাহাড় ও সমতলের আদিবাসীদের উপর চলছে নির্বিচারে গুম-হত্যা, নির্যাতন ও ভূমি দখল। সীমান্তে চলছে মানুষ হত্যা। সর্বত্রাসী এক সংকটে দেশ নিমজ্জিত হতে চলেছে।

বর্তমান শিক্ষার প্রধান ধারা বেসরকারি ও বাণিজ্যিক ধারা। এক কথায় বলা যায় 'টাকা যার শিক্ষা তার' এই নীতিতেই চলছে শিক্ষা



কার্যক্রম। সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে একই পদ্ধতির শিক্ষার কথা থাকলেও দেশে চলছে সাধারণ, ইংরেজি মাধ্যম, কারিগরি, ক্যাডেট ও মাদ্রাসা শিক্ষা নামক বিভিন্ন ধারা। সরকার প্রাথমিক স্তরে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা বললেও চিত্র ঠিক উল্টো। 'ব্যানবেইস ২০১৯ এর রিপোর্ট অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পূর্বে প্রায় ১৮% শিক্ষার্থী, দশম শ্রেণি সমাপ্তের আগে মাধ্যমিক শিক্ষার্থীর প্রায় ৩৮% এবং দ্বাদশ শ্রেণি সম্পন্ন করার পূর্বেই উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থীর প্রায় ২০% শিক্ষার্থী শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বারে পড়ে অর্থাৎ গড়ে প্রায় ৭০% শিক্ষার্থী দ্বাদশ শ্রেণি সম্পূর্ণ করার পূর্বেই বিদ্যালয় থেকে বারে পড়ে'। এই বারে পড়ার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় এর মূল কারণ হচ্ছে দারিদ্র্য, আর্থিক অস্থিতিশীলতা।

তিনি আরও বলেন, ২০২৩ থেকে চালু করা হয়েছে শিক্ষাক্রম ২০২১। কোন প্রকার প্রস্তুতি ও আয়োজন ব্যতিরেকে শিক্ষার্থীদের উপর চাপানো হলো এই কারিকুলাম। ফলত, ছাত্র, শিক্ষক-অভিভাবকেরা পড়ছেন বিপাকে। শিক্ষানুরাগী মানুষের পক্ষ থেকে দাবি উঠেছে ছাত্র, শিক্ষক-অভিভাবকসহ দেশের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদদের মতামত নিয়ে শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন ও পরিমার্জন করার। কিন্তু সরকার সেদিকে কর্ণপাত করছেন না। এই কারিকুলামের আঙ্গিকে নতুন বই জানুয়ারির ১ তারিখে দেয়া হয়েছে। ভুলে ভরা, নিম্নমানের পাঠ্যপুস্তক দেয়া হচ্ছে কোমলমতি শিশু-কিশোরদের হাতে। ইতিমধ্যেই মুদ্রণবিভাগের কারণে সাতক্ষীরা থেকে ৩১ হাজার বই ফেরত নেয়া হয়েছে। এহেন দায়িত্বহীন কাজ শিশু-কিশোরদের মনে দীর্ঘ মেয়াদি ক্ষত তৈরি করবে।

শিক্ষায় বাণিজ্যিকীকরণ, বেসরকারিকরণ নীতির ফলে উচ্চ শিক্ষায় ব্যয় বৃদ্ধি ঘটছে তীব্র

আকারে। দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ৫৭টি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ১১৩টি। উচ্চশিক্ষায় অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে অর্থের বিনিময়ে সার্টিফিকেট কিনতে হচ্ছে। জনগণকে জিম্মি করে চলছে শিক্ষার রমরমা ব্যবসা। ইউনেস্কো শিক্ষাখাতে জিডিপি ৬ ভাগ বরাদ্দের কথা বললেও এ বছর আমাদের বরাদ্দ মাত্র ১.৭৬ শতাংশ, যেটি গতবারের চেয়ে .০৭ শতাংশ কম এবং দক্ষিণ এশিয়ায় মধ্যে সর্বনিম্ন। ক্যাম্পাসগুলিতে শাসক দলের ছাত্র সংগঠনের দ্বারা গণরুম-গেস্টরুম নির্যাতন এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ ও শিক্ষার গণতান্ত্রিক পরিবেশ ধ্বংস করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, প্রতিষ্ঠানগত থেকে ৪ দশকে ছাত্র ফ্রন্ট শিক্ষার বেসরকারিকরণ-বাণিজ্যিকীকরণ, ফি বৃদ্ধি, শিক্ষা সংকোচনের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলন চালিয়ে আসছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রণীত সকল শিক্ষানীতি বিশ্লেষণ করে শাসকশ্রেণির শিক্ষা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির গণবিরোধী রূপ উন্মোচন করেছে ছাত্র ফ্রন্ট। পাশাপাশি 'শিক্ষা নীতি ও শিক্ষা সংকট প্রসঙ্গে' বই প্রকাশ করে সারাদেশে সর্বজনীন বিজ্ঞানভিত্তিক সেকুলার বৈষম্যহীন একই পদ্ধতির (one channel of education) গণতান্ত্রিক শিক্ষানীতির রূপরেখা তুলে ধরে সারাদেশে প্রচার এবং ৬ দিনব্যাপী শিক্ষা সম্মেলন করে দেশের প্রথিতযশা শিক্ষক, শিক্ষাবিদদের মতামত নিয়ে 'শিক্ষা স্মারকগ্রন্থ' প্রকাশ করা হয়েছে। যা শিক্ষা আন্দোলনের এক অমূল্য দলিল হিসেবে সর্বমহলে স্বীকৃত। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণায় বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ ৬ দফা দাবিতে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট তুলে ধরে স্বতন্ত্র পরীক্ষা হল নির্মাণসহ ৮ দফা দাবিতে, স্কুল শিক্ষার সংকট তুলে ধরে দশ দফা দাবিতে এবং

পলিটেকনিকের ৫ দফা দাবিতে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন পরিচালনা করে আসছে ছাত্র ফ্রন্ট। ছাত্র রাজনীতি বন্ধের চক্রান্ত ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করেছে। শিক্ষাঙ্গনে স্বাস্থ্য-দখলদারিত্ব, নির্যাতন, স্বৈরাচার ও মৌলবাদী আক্রমণসহ দেশের জাতীয় সম্পদ রক্ষার আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে গিয়ে ছাত্র ফ্রন্টের অসংখ্য নেতাকর্মী গ্রেপ্তার, নির্যাতন ও হামলার শিকার হয়েছেন।

ছাত্র ফ্রন্ট মনে করে শিক্ষার সংকট সমাজের অপরাপর সংকট থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবন চরম অভাব-দারিদ্র্য আর বৈষম্য-বঞ্চনার ভারে পিষ্ট। তাই শিক্ষা আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতিতে একটি শোষণ-বৈষম্যহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠারই সংগ্রাম। ৪০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সংগ্রামমুখর মুহূর্তে ছাত্র-শিক্ষকসহ দেশবাসীর প্রতি আমাদের আহ্বান শিক্ষা-সংস্কৃতি, মনুষ্যত্ব রক্ষার সংগ্রাম শক্তিশালী করুন। দেশের ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন রুখে দিতে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলুন।

অপরায়ে বাংলার পাদদেশে ৪ দশকের উদ্বোধনী ছাত্র সমাবেশের সমাপনী বক্তব্যে সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুক্ত বাউড় বহরব্যাপী আন্দোলনের নানা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। কর্মসূচিসমূহ:

মার্চ-এপ্রিল '২৪ জেলায় জেলায় বিজ্ঞান উৎসব ও স্কুল উৎসবের আয়োজন। ২৪ জুলাই '২৪ জাতীয় স্কুল কনভেনশন। ৩০ সেপ্টেম্বর '২৪ উচ্চ শিক্ষা কনভেনশন। আগামী ২০২৫ সালে ৪ দশকের সমাপনী ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। নেতৃত্বদ বহরব্যাপী পালিত কর্মসূচি সফল করার জন্য ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

ব্যাটারিচালিত রিকশা বন্ধের সিদ্ধান্ত বাতিল কর

খুলনা শহরের ২৭ ও ২৪ নম্বর
ওয়ার্ডে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ব্যাটারিচালিত রিকশা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত বাতিল করার দাবিতে রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ খুলনা মহানগর কমিটির উদ্যোগে ২১ জানুয়ারি ২৭ ও ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে রিকশা মালিক ও চালকবৃন্দের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের খুলনা মহানগর কমিটির আহ্বায়ক এসএম আলমগীর হোসেন বাবুর সভাপতিত্বে এবং সদস্যসচিব জনার্দন দত্ত নান্টুর সঞ্চালনায় উভয় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা মহানগর কমিটির নেতা কোহিনুর আক্তার কণা, আব্দুল করিম, হারুনুর রশিদ, ইলিয়াস আকন, আব্দুর রাজ্জাক, তরিকুল ইসলাম বুলবুল, দাউদ আকুঞ্জি, মো. জুয়েল হোসেন, নাসিমা আক্তার, জাহাঙ্গীর হোসেন। সমাবেশে নেতৃত্বদ বলেন, এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪



লেনিনের শিক্ষা : মানবমুক্তির সংগ্রামে কেন জরুরি?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কমরেড লেনিনের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

১৮৭০ : বিখ্যাত ভলগা নদীর ধারে সিমবির্‌ক শহরে ১৮৭০ সালের ২২ এপ্রিল ভ্লাদিমির ইলিচ উইলিয়ানভ এক সম্ভ্রান্ত ও অবস্থাপন্ন পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন, ইতিহাসে যিনি তাঁর ছদ্মনাম লেনিন নামেই বিখ্যাত। তাঁর পিতা ইলিয়া নিকোলায়েভিচ উইলিয়ানভ ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষিত। সরকারি স্কুলের পরিদর্শক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করে প্রশাসনের অনেক উচ্চ পদে আরোহণ করেছিলেন। লেনিনের মা ছিলেন এক ধনবান জার্মান ডাক্তারের কন্যা।

লেনিনের জন্মের সময় জার শাসিত রাশিয়ান সাম্রাজ্য এক বিরাট ভূখণ্ড, পৃথিবীর ছয় ভাগের এক ভাগ ভূখণ্ডই ছিল সাম্রাজ্যের অধীন। অঙ্কুত বৈপরিভ্যে ভরা দেশ—একদিকে শিল্প-সাহিত্যে টলস্টয়, দস্তয়ভস্কি বা সঙ্গীতে চাইকোভস্কির মতো ইউরোপীয় আধুনিক সংস্কৃতির মহান স্রষ্টারা যেমন আছেন, তেমনি মধ্যযুগীয় প্রাচীন রীতিনীতি-প্রথা ও কৃষিনির্ভর সামন্ত অর্থনীতি গভীরভাবে সমাজে প্রোথিত।

১৮৮১ : রাশিয়ার শাসক ছিল স্বৈরাচারী স্ফাট জার আর দারিদ্র্য পীড়িত কৃষকেরা ছিল সামন্ত প্রভুদের দাস। লেনিনের জন্মের মাত্র ১০ বছর আগে ১৮৬০ সালে এই দাস প্রথা কাগজে-কলমে রদ করা হয়। দেশের মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা, তাদের উপর অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার ইত্যাদি দেখে উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় ভাবাদর্শের প্রভাবে দেশের বুদ্ধিজীবীদের বিশেষত, তরুণদের মধ্যে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে স্বৈরাচারী জার শাসনের অবসানের ভাবনার জন্ম দেয়। একই বছর ১৩ মার্চ বিপ্লবীদের বোমায় জার আলেকজান্ডার-জারের রাজধানী সেন্ট পিটার্সবুর্গের শ্বেত-প্রাসাদে নিহত হয়। লেনিন তখন ১০ বছরের বালক।

১৮৮৬ : এই বছরের জানুয়ারি মাসে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে লেনিনের পিতা অল্প বয়সে মারা যান।

১৮৮৭ : এই বছরের মার্চ মাসে লেনিনের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের প্রাক-মুহুর্তে একটি ঘটনা লেনিনের বিপ্লবী জীবনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য, কারণ এই ঘটনা তাঁর চিন্তা-ভাবনা ও মানসিকতায় মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। জার স্ফাটকে হত্যার পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট সেন্টপিটার্সবুর্গে বিপ্লবী দলের সদস্য হিসাবে লেনিনের বড় ভাই আলেকজান্ডার গ্রেপ্তার হন। আলেকজান্ডার বিচারের সময় নিজেকে নির্দোষ ঘোষণা করতে এবং ক্ষমা ভিক্ষা করতে অস্বীকার করেন। তার পরিবর্তে তিনি কোর্টে বলেন—‘আমি মনে করি দেশে বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুধু সম্ভব তাই নয়, এটা অনিবার্য। বিপ্লবের কারণে আমি মৃত্যুবরণ করতে ভীত নই।’ ২০ মার্চ তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ভাইয়ের এই আত্মদান লেনিনের মনকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। এই বছরই লেনিন কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন কিন্তু বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে ডিসেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কৃত হন।

১৮৮৮-৯১ : লেনিনের ভাইয়ের মৃত্যুদণ্ড লেনিনকে রাশিয়ার মুক্তির পথ সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। তাঁর ভাইয়ের খুব প্রিয় বই ছিল ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত নিকোলাই চেরনিশেভস্কির বিখ্যাত রাজনৈতিক উপন্যাস *হোয়াট ইজ টু বি ডান*। তিনি সেইটি গভীর মনোযোগের সাথে পাঠ করেন। কোন কোন লেখক উল্লেখ করেছেন যে, এই বইটি পাঠ করে সেই দিনের বহু তরুণের মতো তিনিও বিপ্লবের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন এবং তিনি নাকি মনে করতেন মার্কসের আগে এই বইটি সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা প্রতিভাদীপ্ত বই (The greatest and most talented representative of socialism before Marx)। এই পাঁচ বছর প্রাইভেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ডিগ্রির জন্য

প্রস্তুতির সাথে সাথে লেনিন গভীরভাবে মার্কসের অর্থনীতি-দর্শন, রাজনৈতিক মতাদর্শ পাঠ করতে শুরু করেন একাত্তিভে। ইতিমধ্যেই প্রোখানভের রাশিয়ান ভাষায় লেখা প্রকাশিত বইয়ের মাধ্যমে রাশিয়াতে তরুণ বিপ্লবীরা মার্কসীয় দর্শন ও মতবাদের সাথে পরিচিত হতে শুরু করেছে। লেনিনও প্রোখানভের লেখা বই বা তাঁর অনূদিত মার্কসের বই পড়েই মার্কসবাদ আয়ত্ত করেন। পরবর্তী সময়ে আমরা জানি প্রোখানভের সাথে লেনিনের মতবিরোধ হয়েছে অনেক প্রশ্নে, তা সত্ত্বেও প্রোখানভের এই অবদানের প্রতি লেনিন তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। নভেম্বর বিপ্লবের চার বছর পরে যখন পাঠ্য বইতে কমিউনিজমের পাঠের সিলেবাস নির্ধারণ করার প্রসঙ্গ এসেছে তখন লেনিন প্রোখানভের রচনাকে অবশ্য পাঠ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে বলেছেন এবং সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, তরুণ পার্টি কর্মীদের উদ্দেশ্যে লেনিন বলেছিলেন যে—

‘তরুণ পার্টি সদস্যদের উপকারের জন্য আমাকে এই কথা যোগ করতেই হবে যে, তোমরা কেউ প্রোখানভের সমস্ত দার্শনিক লেখাগুলো পাঠ বলতে আমি বোঝাতে চাই, অনুশীলন না করে যথার্থ ধীমান কমিউনিস্ট হয়ে ওঠার আশা করো না—কারণ মার্কসবাদের উপর এর চেয়ে প্রকৃষ্ট পৃথিবীর আর কোথাও কিছু লেখা হয়নি।’ (লেনিন ১৯২১ গ, পৃ. ৯৪) প্রথম প্রজন্মের রাশিয়ান মার্কসবাদীরা—যাঁরা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি গঠন করেছিলেন—তাঁরাও যে প্রোখানভ পাঠ করেই মার্কসবাদের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন সেই কথাও অকপটে লেনিন বলেছেন। অবশ্য এই কারণে রাশিয়ায় বা বিশ্বের সাম্যবাদী আন্দোলনে কোথাও কেউ দাবি করেননি যে, রাশিয়ান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি গড়ে উঠেছিল প্রোখানভের চিন্তার ভিত্তিতে। ১৮৯১ সালে লেনিন অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে সেন্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে আইনশাস্ত্রের ডিগ্রি লাভ করেন এবং থাকার জন্য এই শহরে চলে আসেন।

১৮৯৩ : সেন্ট পিটার্সবুর্গ শহরে এসেই তরুণ লেনিন বিভিন্ন মার্কসিস্ট গোষ্ঠীগুলোর সাথে পরিচিতি ও সম্পর্ক গড়ে তুলতে শুরু করলেন। সেই সময় মার্কসিস্ট গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া, কৃষিনির্ভর রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ আদৌ সম্ভব কিনা তা নিয়ে সংশয় ও চূড়ান্ত বিভ্রান্তি ছিল এবং যথেষ্ট সংখ্যক যথার্থ শিল্প শ্রমিকের অনুপস্থিতিতে মার্কসবাদ অনুসারী শ্রমিক বিপ্লবের সম্ভাবনা নেই বলে মার্কসবাদের বিপ্লবী তত্ত্বের প্রবল সমালোচনা করা হতো। নারদনিকরা এবং তাদের প্রভাবিত বুদ্ধিজীবীরা যেহেতু এই মতের সমর্থক ছিল, সেই কারণে এই বিভ্রান্তির গভীরতা ও ব্যাপ্তি ছিল অনেক দূর পর্যন্ত। ‘The Ancients’ নামে একটি মার্কসিস্ট চক্রের সদস্য জি বি ক্রাসিনের বক্তৃতা *বাজার প্রসঙ্গে* সমালোচনা করে লেনিন একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাদের ভ্রান্তি ও সংশয় দূর করতে তরুণ লেনিন এই বছর প্রকাশ করলেন সেই অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ On the So-Called Market Question। কার্ল মার্কসের দাস ক্যাপিটালের দ্বিতীয় খণ্ডের একবিংশ পরিচ্ছেদের তৃতীয় অংশ ‘The Reproduction and Circulation of the Aggregate Social Capital’কে অবলম্বন করে লেনিনের যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্য তরুণ বিপ্লবীদের মধ্যে প্রবল সাড়া ফেলে। সেন্ট পিটার্সবুর্গে সদ্য আসা তরুণ মার্কসিস্ট বিপ্লবীর ভাষণ শুনতে যারা সেদিন পাঠচক্রে উপস্থিত ছিলেন তার মধ্যে ছিলেন এক তরুণী বিপ্লবী—ক্রুপস্কায়া। তিনি সেই দিনের বর্ণনা দিতে গিয়ে পরবর্তীকালে লিখেছেন—‘আমাদের নতুন মার্কসিস্ট বন্ধুটি অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে বাজারের প্রসঙ্গটির উপর আলোকপাত করলেন। তিনি এটিকে জনগণের স্বার্থের সাথে যুক্ত করে বোঝালেন এবং তাঁর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এমন ছিল

যে, সকলেই অনুধাবন করল যে, মার্কসবাদ এক জীবন্ত দর্শন যা পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা এবং তার বিকাশের ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।’ লেনিনের এই মার্কসীয় ব্যাখ্যাই কয়েক বছর পরে সাইবেরিয়ায় অন্তরীণ অবস্থায় লেখা *The Development of Capitalism in Russia*. বইতে পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়।

১৮৯৫ : সেন্ট পিটার্সবুর্গ শহরের মার্কসিস্ট চক্রগুলোকে নিয়ে লেনিন ‘লিগ অব স্ট্রাগল’ তৈরি করে বিপ্লবের কাজকে সংহত করার চেষ্টা করছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই বিদেশে প্রোখানভের ‘ইমানশিপেশন অব লেবার’ গ্রুপের কমরেডদের সাথে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু জারের প্রশাসনের কাছ থেকে বিদেশে যাওয়ার ছাড়পত্র পাচ্ছিলেন না। হঠাৎ করেই যাওয়ার সুযোগ ঘটে এবং তিনি প্রথমবারের মতো বিদেশে যান। সেখানে মে মাসে প্রোখানভের সাথে জেনেভাতে সাক্ষাৎ ঘটে এবং তাঁরা সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রচারের জন্য *রাবোদনিক* পত্রিকা প্রকাশের বিষয়ে আলোচনা করেন। লেনিনের সাথে ল্যাফার্গ, লিবনেখট প্রমুখ মার্কসবাদীদের পরিচয় ঘটে। সেপ্টেম্বর মাসে লেনিন দেশে ফিরে আসেন, কিন্তু ডিসেম্বর মাসে জারের পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে।

১৮৯৭ : ১৮৯৫ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেলে থাকার পর, লেনিনকে তিন বছরের জন্য সাইবেরিয়াতে নির্বাসনে পাঠানো হয়। এই সময়ে লেনিন *The Development of Capitalism in Russia* এবং *The Tasks of the Russian social democrats* বই দুটো লেখেন যা নারদনিক মতবাদ ও সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট পার্টির মধ্যে অর্থনীতিবাদকে পরাস্ত করতে হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

১৮৯৮ : রাশিয়ার মিনস্ক শহরে কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে রাশিয়ার প্রথম মার্কসিস্ট দল রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি গঠিত হয়। লেনিনের অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে গৃহীত অনেক প্রস্তাবই সঠিক মার্কসবাদী দলের চরিত্র অনুযায়ী হয়নি বলে লেনিন এই কংগ্রেস ও গঠিত হওয়া দলের কার্যকারিতা সম্পর্কে খুব খুশি ছিলেন না। এই বছরের জুলাই মাসে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে থাকার সময়ই ক্রুপস্কায়াকে বিবাহ করেন।

১৯০০ : নির্বাসন দণ্ড শেষ হওয়ার কারণে এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে লেনিন আবার সেন্ট পিটার্সবুর্গে ফিরে আসেন। বিপ্লবীদের একটি মুখপত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে লেনিন বুঝতে পারেন যে, দেশের অভ্যন্তরে তা কিছুতেই সম্ভব নয়। তিনি পশ্চিম ইউরোপে আশ্রয় নেন এবং এই বছরের ডিসেম্বর মাসে জার্মানি থেকে ইস্ত্র প্রকাশ শুরু করেন।

১৯০২ : সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি গঠিত হলেও দেশে এবং বিদেশে ছড়িয়ে থাকা নানা মার্কসীয় গ্রুপগুলোর মধ্যে নানা প্রশ্নে মতভেদ ছিল প্রবল। সমস্ত মতভেদগুলো দূর করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি সংহত দল গড়ে তোলার জন্য সেই মুহুর্তে বিপ্লবীদের কাছে করণীয় দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য লেনিন তাঁ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বই *কী করিতে হইবে* লেখেন।

১৯০৩ : এই বছরের জুলাই-আগস্ট মাসে পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে ব্রাসেলসে শুরু হলেও মাঝপথে সরকারি নিষেধাজ্ঞার কারণে লন্ডনে কংগ্রেসকে স্থানান্তরিত করতে হয়। এই কংগ্রেস থেকেই মূলত, দলের মধ্যে বলশেভিক ও মেনশেভিক মতপার্থক্যের সূচনা ঘটে।

১৯০৪ : এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে রুশ-জাপান যুদ্ধ শুরু হয়। যথার্থ মার্কসবাদী বিপ্লবী দলের সংগঠন সম্পর্কিত নীতিগুলো সুস্পষ্ট করতে লেনিনের *ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড, টু স্টেপ ব্যাক* বই প্রকাশিত হয়। বাকুতে তেল-খনির শ্রমিকদের ঐতিহাসিক ধর্মঘাটে মালিকপক্ষ দাবি মেনে নিতে

বাধ্য হয়। সেন্ট পিটার্সবুর্গের সর্ববৃহৎ কারখানা পুটিলভে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হয়, অন্যান্য শহরের কারখানাতেও ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে এবং সাধারণ ধর্মঘট শুরু হয়।

১৯০৫ : জানুয়ারির ৯ তারিখে (নতুন ক্যালেন্ডারে ২২ তারিখ) শ্রমিকদের শ্বেতপ্রাসাদ অভিযানে জারের বাহিনী গুলি চালালে সহস্রাধিক শ্রমিক নিহত হয়। ইতিহাসে ‘রক্তাক্ত কালো রবিবার’ হিসাবে দিনটিকে অভিহিত করা হয়। মানুষ ক্ষেপে ওঠে জার সরকারের উপর। ইভানোভা ভোজনেজেনস্ক শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হয়। রাশিয়ার প্রথম শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত এরাই গড়ে তুলেছিল। বিভিন্ন শহরের ফ্যাক্টরিতে শুরু হয় শ্রমিক ধর্মঘট। জুন মাসে পটেমকিন যুদ্ধজাহাজ জারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শ্রমিক অভ্যুত্থানের পক্ষে অবস্থান নেয়। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের সূচনা ঘটে, যা অবশ্য শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। লেনিন গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণির ভূমিকা সম্পর্কে মার্কসীয় ব্যাখ্যা উপস্থিত করলেন তাঁর *Two Tactics of Social Democracy in the Democratic Revolution* বইতে। এপ্রিল-মে মাসে তৃতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হলো লন্ডনে। লেনিনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গৃহীত হয়। নভেম্বরে লেনিন দেশে ফেরেন। ডিসেম্বরে ফিনল্যান্ডে বলশেভিক কনফারেন্স আহ্বান করা হয়, যেখানে লেনিনের সাথে স্তালিনের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে।

১৯০৭ : পার্টির পঞ্চম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় লন্ডনে। জারের পুলিশের হাত থেকে গ্রেপ্তার এড়িয়ে দেশের মধ্যে কাজ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। লেনিন ডিসেম্বর মাসে দেশ থেকে গোপনে ইউরোপে সুইজারল্যান্ডে আশ্রয় নেন।

১৯০৮ : এই বছরের ডিসেম্বর মাসে লেনিন সুইজারল্যান্ড থেকে প্যারিসে চলে আসেন। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানী মাখের দর্শনে প্রভাবিত হয়ে একদল বলশেভিক ও মেনশেভিক বুদ্ধিজীবী মার্কসবাদকে আক্রমণ করতে শুরু করেন। প্রত্যক্ষবাদী ভ্রান্ত দর্শনের বিরুদ্ধে লেনিন কয়েকটি নোট (*Notes of an Ordinary Marxist on Philosophy*) শ্রমিক পাঠচক্রে পড়ার জন্য লেখেন।

১৯০৯ : প্রত্যক্ষবাদীদের হাত থেকে মার্কসবাদকে রক্ষা করতে লেনিন প্রকাশ করেন তাঁর বিখ্যাত বই *Materialism and Empirio-Criticism : Critical comments on a Reactionary Philosophy*।

১৯১২ : প্রাগে অনুষ্ঠিত হয় ষষ্ঠ পার্টি কনফারেন্স। এই কনফারেন্সেই মেনশেভিকদের বহিস্কার করে পার্টি নতুন নাম গ্রহণ করে—রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি (বলশেভিক)। ১৯০৩ সাল থেকে পার্টির অভ্যন্তরে ধারাবাহিকভাবে যে মতাদর্শগত বিতর্ক চলছিল তার চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। লেনিন এই বছরের জুন মাসে অস্ট্রিয়ার অন্তর্গত পোল্যান্ডের ক্রাকোভে চলে আসেন।

১৯১৩ : লেনিনের পক্ষে সেখানে বেশিদিন থাকা সম্ভব হয়নি। তিনি এই বছরের মে মাসে বাসস্থান বদল করে পোরোনিং নামে এক পোলিশ গ্রামে বসবাস শুরু করেন।

১৯১৪-১৮ : ১৯১৪ সালের আগস্ট মাস থেকে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়। লেনিন আবার সুইজারল্যান্ডে আশ্রয় নেন। যুদ্ধের সময় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির শ্রমিকদের ভূমিকা কী হবে তা নিয়ে লেনিনের সাথে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বের প্রবল মতাবিরোধ দেখা দেয়। স্বদেশিকতার নাম করে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে সংঘটিত যুদ্ধে এক দেশের শ্রমিক অন্য দেশের শ্রমিকের বিরুদ্ধে গুলি চালাবে লেনিন ছিলেন তার ঘোর বিরোধী।

১৯১৭ : মার্চের ৮ তারিখ সেন্ট পিটার্সবুর্গ এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

লেনিনের শিক্ষা : মানবমুক্তির সংগ্রামে কেন জরুরি?

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

শহরে শ্রমিক বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। জার নিকোলাস সিংহাসনচ্যুত হন এবং প্রতিশ্রুতিসহ সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে। লেনিন এপ্রিল মাসে জার্মানি থেকে রাশিয়াতে এসে পৌঁছান এবং সেন্ট পিটার্সবুর্গে উপস্থিত হয়ে তাঁর বিখ্যাত এপ্রিল থিসিস ঘোষণা করেন, যার মূল কথা হলো কোন রকম দেরি না করে বুর্জোয়াশ্রেণির করায়ত্ত প্রতিশ্রুতিসহ সরকারকে উৎখাত করে শ্রমিক বিপ্লব সংঘটিত করতে হবে, শ্রমিক-কৃষক, সেনা সোভিয়েতগুলিকেই রাষ্ট্রের ক্ষমতা গ্রহণ করতে হবে। প্রতিশ্রুতিসহ সরকার সোভিয়েতগুলোকে ভেঙে বলশেভিকদের শেষ করতে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে। লেনিন আত্মগোপন করেন। জুলাইয়ের ২৪ তারিখে কেরেনস্কি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন। ৭ নভেম্বর বলশেভিকরা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে। ডিসেম্বরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বুর্জোয়াশ্রেণি ও তাদের সহযোগী শক্তি হোয়াইট গার্ড তৈরি করে ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের শেষ চেষ্টা চালায়। বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশও রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে সৈন্য পাঠিয়ে তাদের মদত দিতে থাকে। গৃহযুদ্ধের সূচনা ঘটে।

১৯১৮ : জার্মানির সাথে ব্রেস্ট-লিটভস্ক চুক্তি সম্পাদিত হয় নতুন সোভিয়েত সরকারের এবং জার্মানির সাথে যুদ্ধ স্থগিত হয়। আগস্টের ৩০ তারিখে হত্যার উদ্দেশ্যে লেনিনের উপর আক্রমণ হয়। নভেম্বরে ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৯২০ : এই বছরের এপ্রিল মাসে পোল্যান্ড সোভিয়েত রাশিয়ার কিছু অংশ দখল করে। লাল-ফৌজের প্রতিআক্রমণে জুন মাসের মধ্যেই তাঁরা ওয়ারশতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। নভেম্বরের মধ্যে কৃষকসাগর অঞ্চলে হোয়াইট গার্ডদের যেটুকু প্রতিরোধ ছিল, তাও ধ্বংস হয়ে যায়।

১৯২১ : এই বছরের মার্চ মাসে দশম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় এবং লেনিন নিউ ইকনমিক পলিসি ঘোষণা করেন এবং তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। নিউ ইকনমিক পলিসি কংগ্রেসে গৃহীত হয়।

১৯২২ : লেনিন শারীরিক অসুস্থতার কারণে এই বছরের এপ্রিল মাসে স্তালিন পার্টির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মে মাসে লেনিনের প্রথম পক্ষাঘাত হয়। ডিসেম্বর মাসে তাঁর দ্বিতীয়বার পক্ষাঘাত ঘটে।

১৯২৩ : এই বছরের মার্চ মাসে লেনিনের তৃতীয়বারের মতো পক্ষাঘাত ঘটে এবং তিনি বাকরুদ্ধ হয়ে যান।

১৯২৪ : এই বছরের জানুয়ারি মাসে কমরেড লেনিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

লেনিন এবং মার্কসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা

সেন্ট পিটার্সবুর্গ শহর থেকে নারদনিকদের একটি মাসিক পত্রিকা *Russkoye Bogatstvo* দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হতো। ১৮৯০ সালের পর থেকে এই পত্রিকা নিয়মিতভাবে সাধারণভাবে মার্কসবাদ এবং বিশেষভাবে রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিরূপ সমালোচনা করে আসছিল। একই সাথে তাঁরা জারের সরকারের সাথে আপস করার ওকালতি করত। এই পত্রিকার পাঠক সংখ্যা ছিল কয়েক হাজার, বিভিন্ন জায়গায় তাদের নিজস্ব রিডিং রুম ছিল, লাইব্রেরি ছিল এবং সংগঠনের বিস্তারও ছিল বহুদূর পর্যন্ত। যে কারণে প্রচারের মাধ্যম হিসাবে এই পত্রিকা ছিল খুবই শক্তিশালী। নব্বইয়ের দশকের প্রথমার্ধে মতবাদিক বিতর্কের জন্য এই পত্রিকা our so-called Marxists, or Social-Democrats-এই শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে সাহিত্য-সংস্কৃতি, রাশিয়ায় অর্থনৈতিক বিকাশের সমস্যা ইত্যাদি প্রসঙ্গে মার্কসবাদের তীব্র সমালোচনা করে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে।

নারদনিকদের মতবাদিক আক্রমণের জবাব

দেওয়ার উদ্দেশ্যে লেনিন ১৮৯২-৯৩ সাল থেকেই প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এই সময় তিনি সামারার মার্কসিস্ট সার্কেলে উদারনৈতিক ও মার্কসবাদ বিরোধী নারদনিকদের সমালোচনামূলক কয়েকটি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাও তাঁর পরিকল্পিত প্রচার পুস্তিকার রসদ সংগ্রহের কাজে আসে। ১৮৯৪ সালে এদের উত্থাপিত প্রশ্নগুলো ধরে ধরে লেনিন একটি বৃহদাকার প্রচার পুস্তিকা তিনটি ভাগে লেখেন-‘What the Friends of the People Are and How They Fight the Social-Democrats (Reply to Articles in Russkoye Bogatstvo Opposing the Marxists)’ ১৮৯৪ সালের শরৎকালে তিনি এই প্রচার-পুস্তিকা প্রথম পাঠ করেন। এই প্রচার-পুস্তিকায় লেনিন শুধুমাত্র নারদনিক তত্ত্বের অন্তঃসারশূন্যতা তুলে ধরেন তাই নয়, পরবর্তী সময়ে রাশিয়ান বিপ্লবের তাত্ত্বিক কাঠামোর প্রাথমিক কাজটিও সেরে ফেলেন। এই প্যামফ্লেট সম্পর্কে ক্রুপস্কায়া তাঁর লেনিনের স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন ‘এটা আমাদের সবাইকে কীভাবে যে শিহরিত করেছিল। এই প্যামফ্লেট প্রশংসনীয় স্বচ্ছতায় লড়াইয়ের উদ্দেশ্য স্থির করে দিয়েছিল। পাঠের পরে হেক্টোগ্রাফ প্রতিলিপি *The Yellow Copy-Books* নাম দিয়ে হাতে হাতে প্রচার করা হয়েছিল। কারো কোন স্বাক্ষর থাকত না। বহু পঠিত এই প্যামফ্লেট তরুণ মার্কসবাদীদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।’

রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের এই পর্বে (১৮৮৪-৯৪) মার্কসীয় তত্ত্ব, মার্কসীয় বিপ্লবী ভাবনা এবং সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক কার্যক্রম ইত্যাদি সবেমাত্র আত্মপ্রকাশ করেছে এবং রাজনৈতিক পরিসরে জায়গা করে নিতে শুরু করেছিল। তখনো পর্যন্ত মার্কসীয় আন্দোলন কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রুপ বা সার্কেলে বিভক্ত এবং ব্যাপকতর শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে হয় সম্পর্কহীন অথবা উল্লেখ করার মতো সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। আবার, রাশিয়ায় মার্কসবাদী আন্দোলনের সূচনা করা এবং মার্কসবাদ অনুসারী বহু বিপ্লবী তৈরি করা ইত্যাদি কাজ প্রুখানভ প্রতিষ্ঠিত ‘Emancipation of Labour’ যথোপযুক্তভাবে করলেও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভুলও তাদের চিন্তার মধ্যে ছিল। জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লব সমাধা করার জন্য শ্রমিক শ্রেণিকেই কৃষকদের নেতৃত্ব দিতে হবে এবং তার জন্য যে কৃষকশ্রেণির সাথে মৈত্রী গড়ে তোলা অত্যন্ত আবশ্যিক সে কথা প্রুখানভের তত্ত্বে ছিল না। প্রুখানভ মনে করতেন যে, রাশিয়ার বিপ্লবে উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের কাছে থেকে অস্থায়ীভাবে হলেও কখনো কখনো সমর্থন পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু কৃষকশ্রেণির সমর্থনকে তিনি গুরুত্বই দেননি। তিনি লিখেছিলেন ‘বুর্জোয়া এবং সর্বহারা ছাড়া দেশে আর কোন সামাজিক শক্তি আমাদের ধারণায় নেই যাদের থেকে বিপ্লবী জোট সমর্থন পেতে পারে।’ (প্রুখানভ, পৃ. ১১৯) এই বিভ্রান্তি পরবর্তী সময়ে মেনশেভিকদের রাজনৈতিক অবস্থানের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। রাশিয়াতে মার্কসবাদী আন্দোলনকে সংঘবদ্ধ করা এবং প্রুখানভ গোষ্ঠীর ভুল-ত্রুটিগুলিকে কাটিয়ে উঠার কাজটি করেন কমরেড লেনিন।

১৮৮৭ সাল। কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় ভ্লাদিমির ইলিচ উইলিয়ানভ, পরবর্তীকালে যিনি কমরেড লেনিন নামে পরিচিত হন, প্রথম বিপ্লবী ছাত্র রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন এবং একটি মার্কসীয় গোষ্ঠীতে যোগ দেন। বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে গ্রেপ্তার হন এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হয়ে সামারা শহরে স্থানান্তরিত হন। অচিরেই সেই শহরে প্রথম মার্কসীয় সার্কেল তিনি গড়ে তোলেন। কয়েক বছর পর ১৮৯৩ সালে লেনিন যান সেন্ট পিটার্সবুর্গ শহরে। সেই শহরে রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনায় অত্যন্ত অগ্রসর শ্রমিকদের নিয়ে তৈরি

মার্কসীয় সার্কেলগুলো মার্কসীয় তত্ত্ব সম্পর্কে লেনিনের বিস্ময়কর গভীর জ্ঞান, রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণে মার্কসীয় তত্ত্বের প্রজ্ঞাদীপ্ত প্রয়োগ, শ্রমিকশ্রেণির বিজয় সম্পর্কে তাঁর স্থির প্রত্যয় এবং অসামান্য সাংগঠনিক দক্ষতা ইত্যাদির কারণে তিনি অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে পরিগণিত হন। সেন্ট পিটার্সবুর্গ শহরের শ্রমিক পাঠচক্রগুলোতে লেনিন নিয়মিত মার্কসীয় রাজনীতির ক্লাস নিতে থাকেন। ১৮৯৫ সালে তিনি এই শহরের সমস্ত মার্কসীয় চক্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে ‘League of Struggle for the Emancipation of the Working Class’ নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এইভাবেই তিনি শ্রমিকশ্রেণির মার্কসীয় বিপ্লবী দল প্রতিষ্ঠার পথ রচনা করেন।

‘লিগ অব স্ট্রাগল’ প্রতিষ্ঠার পরই লেনিন লিগের জন্য শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ তৈরি করা এবং সেই আন্দোলনগুলোতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেওয়ার লক্ষ্য স্থির করেন। ভাবনায় অগ্রসর শ্রমিকদের থেকে বাছাই করে কয়েকজনের মধ্যে মার্কসবাদ প্রচারের যে কর্মসূচি নিয়ে এতদিন কাজ হচ্ছিল তার থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে সেই সময়ের শ্রমিকদের দাবিকে ভিত্তি করে বৃহত্তর শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে রাজনৈতিক বিক্ষোভের জন্ম দিতে সচেষ্ট হওয়ার কর্মসূচি নির্ধারণ করেন তিনি। এই কর্মসূচি যে গণবিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল তা পরবর্তী সময়ে রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলন গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছিল। কাজের পরিবেশের উন্নতি, শ্রমঘণ্টা কমানো এবং মজুরি বৃদ্ধি ইত্যাদি অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার সাথে জারতন্ত্র উচ্ছেদের রাজনৈতিক দাবিকেও যুক্ত করে ‘লিগ অব স্ট্রাগল’ শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয় এবং শ্রমিক শ্রেণিকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করে তুলতে শুরু করে।

নব্বইয়ের দশকে দ্রুত কলকারখানা প্রসার ঘটছিল এবং তার সাথে শ্রমিকদের সংখ্যাও বেড়ে চলছিল। নারদনিকদের তত্ত্বকে মিথ্যা প্রমাণ করে বিপ্লবী আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণির অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং উত্তরোত্তর তাঁরা নেতৃত্বকারী ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকে। লেনিনের পরিচালনায় সেন্ট পিটার্সবুর্গের ‘লিগ অব স্ট্রাগল’-ই প্রথম যারা শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনের সাথে সমাজতন্ত্রের দাবিকে যুক্ত করে। লেনিন এই কারণেই সেন্ট পিটার্সবুর্গের ‘লিগ অব স্ট্রাগল’-কে বলেছেন ‘একটি বিপ্লবী পার্টির যথার্থ ভ্রূণাবস্থা যা শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনের সমর্থনে গড়ে উঠেছিল’ (real rudiment of a revolutionary party which was backed by the working class movement)। লেনিন পরবর্তী সময়ের মার্কসিস্ট সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি গড়ে তোলার শিক্ষা এই সময়ের বিপ্লবী সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকেই গ্রহণ করেন।

লেনিন এবং তাঁর সহযোগীরা অনেকেই এই সময়ে জারের পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। তাঁরা যখন কারাগারে তখন তরুণ বিপ্লবীদের নিয়ে বহু নতুন নতুন মার্কসিস্ট সার্কেল গড়ে উঠতে থাকে এবং মার্কসবাদের প্রতি আকর্ষণে এইসব তরুণ বিপ্লবীদের অনেকে ‘লিগ অব স্ট্রাগল’-এর আন্দোলনের সাথেও যুক্ত হন। এঁরা নিজেদেরকে উল্লেখ করত ‘Young’ বলে এবং লেনিন ও তাঁর সহযোগীদের উল্লেখ করত ‘Old Fellows’ নামে। এই অর্বাচীন বিপ্লবীরা শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে এক নতুন বিভ্রান্তির জন্ম দিল। তাঁরা ঘোষণা করল যে, শ্রমিকরা শুধুমাত্র মালিকদের কাছ থেকে অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্য সংগ্রাম করবে। তাদের বক্তব্য ছিল, রাজনৈতিক দাবি উত্থাপন শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। তাঁরা বিশ্বাস করত রাজনৈতিক আন্দোলন করার দায়িত্ব উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের, সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার কাজ উদারনৈতিক

বুর্জোয়াদের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। এই অর্বাচীন বিপ্লবীদের হাত ধরেই রাশিয়ার মার্কসীয় আন্দোলনের মধ্যে ‘অর্থনীতিবাদী’ নামে প্রথম আপসকামী ও সুবিধাবাদী ধারার অনুপ্রবেশ ঘটে।

প্রথম কংগ্রেস, অর্থনীতিবাদের বিরুদ্ধে

লেনিনের সংগ্রাম এবং ইচ্ছার প্রকাশ

সেন্ট পিটার্সবুর্গ শহর ছাড়া ‘লিগ অব স্ট্রাগল’ মস্কো, কিয়েভ ও অন্যান্য শহরে সংগঠিত হওয়ায় এদের সবাইকে এক কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে নিয়ে এসে পার্টি গঠনের উদ্দেশ্যে বন্ড (Bund) কে সাথে নিয়ে কংগ্রেস আহ্বান করা হয়। ১৮৯৮ সালের মার্চ মাসে মিনস্ক শহরে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি বা R.S.D.L.P-এর প্রথম কংগ্রেস হিসাবে পরিচিত। লেনিন সাইবেরিয়াতে নির্বাসিত হওয়ার কারণে কংগ্রেসে যোগদান করতে পারেননি। প্রথম কংগ্রেস সমস্ত দিক থেকেই উদ্দেশ্যপূরণে ব্যর্থ হয়। কারণ, কংগ্রেসে যে ইশতেহার গৃহীত হয় তাতে সর্বহারা শ্রেণির রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের কথা, সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার কথা এবং জারতন্ত্র ও বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামে মিত্রশ্রেণি নির্ধারণ করা প্রসঙ্গ ইত্যাদি মৌলিক বিষয়গুলোর কোন উল্লেখ ছিল না। ফলে, কংগ্রেস থেকে ঘোষণার মাধ্যমে R.S.D.L.P পার্টি গঠিত হয় ঠিকই, তবে সমস্ত মার্কসিস্ট সার্কেলকে ঐক্যবদ্ধ করা, সাধারণভাবে বিপ্লবের কর্মসূচি ঠিক করা, পার্টির নিয়মাবলি তৈরি করা এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গঠন করা ইত্যাদি কোনকিছুই চূড়ান্ত না হওয়ায় পার্টির অভ্যন্তরে চরম বিভ্রান্তি দেখা দেয়। এই বিভ্রান্তিকর ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সুযোগে শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনের মধ্যে সুবিধাবাদী অর্থনীতিবাদের ‘Economism’ প্রবক্তারা প্রভাব বিস্তার করে ফেলে। পরবর্তী সময়ে বিপ্লবী পত্রিকা *ইস্ক্রা*-কে হাতিয়ার করে বহু বছর ধরে নিরলস রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে যথার্থ কমিউনিস্ট বিপ্লবী দল হিসাবে গঠন করার পথ তৈরি করেন। সংগ্রাম চালিয়ে কমরেড লেনিন সুবিধাবাদী অর্থনীতিবাদকে পরাস্ত করেন এবং সাইবেরিয়াতে নির্বাসনকালে কমরেড লেনিন প্রমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ *The Development of Capitalism in Russia* বইটি সম্পূর্ণ করেন। এই বইটি নারদনিকদের ভ্রান্ত অর্থনীতিবাদের স্বরূপ উন্মোচন করার উদ্দেশ্যেই লেখা, কিন্তু কু যিনির্ভর অনগ্রসর দেশে পুঁজিবাদের বিকাশের প্রশ্নটি মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে কীভাবে বিবেচনা করতে হবে তার মূল্যবান ও মৌলিক ব্যাখ্যা কমরেড লেনিন এই বইতে উপস্থিত করেন। এই কারণে মার্কসীয় সাহিত্যে এই বইটির গুরুত্ব অপরিসীম। নারদনিক অর্থনীতিবিদরা প্রচার করত যে রাশিয়ায় পুঁজিবাদ বিকাশের সুযোগ নেই। তার কারণ হিসাবে তাদের অন্যতম যুক্তি ছিল যে গ্রামীণ অর্থনীতির সংকটের কারণে অভ্যন্তরীণ দেশীয় বাজার ক্রমাগত সংকুচিত হচ্ছে এবং রাশিয়ায় পুঁজি বিকাশের সূচনা ইউরোপের তুলনায় অনেক পরে হওয়ার কারণে বিদেশের বাজার পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এমতাবস্থায় পুঁজিপতিদের উদ্বৃত্ত উসূল (realisation of surplus) করার কোন উপায় নেই। তাদের মতানুসারে রাশিয়ার পুঁজিবাদ এক জন্ম-মৃত শিশু। তাদের যুক্তির উত্তরে মার্কসীয় ব্যাখ্যা উল্লেখ করে লেনিন দেখান যে, সামাজিক শ্রম-বিভাজনের অগ্রগতিই পণ্য অর্থনীতি এবং পুঁজিবাদ বিকাশের সমগ্র প্রক্রিয়ার ভিত্তি। তাদের যুক্তির উত্তরে মার্কসীয় ব্যাখ্যা উল্লেখ করে লেনিন দেখান যে, সামাজিক শ্রম-বিভাজনের অগ্রগতিই পণ্য অর্থনীতি এবং পুঁজিবাদ বিকাশের সমগ্র প্রক্রিয়ার ভিত্তি। দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদের বিকাশ শুরু হলে কৃষির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শিল্প ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে হ্রাস পায়।

(চলবে)

একতরফা প্রহসনমূলক নির্বাচন বাতিল, নির্বাচন কমিশনের পদত্যাগ ও তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে বাম গণতান্ত্রিক জোটের বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত



একতরফা নির্বাচনী তফসিল বাতিল, নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচন, দমন-পীড়ন, শ্রেণ্তার বন্ধ, পেঁয়াজসহ নিতাপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে হবে।
বাম গণতান্ত্রিক জোট



১৮ ডিসেম্বর '২৩ থেকে ৭ জানুয়ারি '২৪ নির্বাচন পর্যন্ত নির্বাচনে অংশ না নেওয়া দলগুলির সভা-সমাবেশের উপর সংবিধান বিরোধী নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে মুখে কালো কাপড় বেঁধে ২২ ডিসেম্বর '২৩ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও পরবর্তীতে বিক্ষোভ মিছিল



স্বৈরাচার পতন দিবস উপলক্ষে ৬ ডিসেম্বর '২৩ পল্টন মোড়ে অনুষ্ঠিত সমাবেশে একতরফা নির্বাচন বর্জন ও রুখে দেয়া এবং নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচন, দমন-পীড়ন, শ্রেণ্তার বন্ধ ও পুনঃতফসিল ঘোষণার দাবিতে বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমাবেশ ও পরবর্তীতে মিছিল অনুষ্ঠিত।

৩০ ডিসেম্বর ভোট ডাকাতির ৫ বছর

ভোট ডাকাতির ৫ বছর; ৩০ ডিসেম্বর '২৩ কালো দিবসে বাম গণতান্ত্রিক জোটের উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ থেকে ৭ জানুয়ারি '২৩ প্রহসনের একতরফা নির্বাচন বর্জন ও রুখে দাঁড়ানোর জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান।

নেতৃবৃন্দ বলেন, '১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ সরকার দিনের ভোট রাতে অর্থাৎ নিশি ভোটের মাধ্যমে অবৈধভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে আছে।

আওয়ামী লীগ সরকার ২০১৪ সালে বিনাভোটে '১৮ সালে নিশি ভোটে এবং ৭ জানুয়ারি '২৪ একতরফা 'ডামি' নির্বাচন করে ক্ষমতা দখলে রাখতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশের জনগণ অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন সূষ্ঠ ও নিরপেক্ষ হয় না। ফলে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানিয়ে আসছিল।



সংসদ ভেঙে দিয়ে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন দাও বাম জোটের সংবাদ সম্মেলন

৪ জানুয়ারি '২৪ পুরানা পল্টনস্থ মুক্তিভবনের মৈত্রী মিলনায়তন অনুষ্ঠিত বাম গণতান্ত্রিক জোটের সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়েছে, সরকার সকলের অংশগ্রহণে নির্বাচনের দাবি উপেক্ষা করে একতরফা নির্বাচনের পথে হাটছে। সরকারি ভাগবাটোয়ারা ও আনুকূল্যের বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা জিততে ও সরকারের পক্ষ থেকে

করেছে। নির্বাচনে কে ক্ষমতায় যাবে এটি এখন আর আলোচ্য বিষয় নয়। এক ব্যক্তি, একই জায়গায় থেকে নিজদল, নিজ দলের স্বতন্ত্র, ১৪ দলের শরিক দল, মিত্র দল, জাতীয় পার্টির প্রার্থী সবাইকে মনোনয়ন দিচ্ছে। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয় সরকার গণদাবি উপেক্ষা করে ৭ জানুয়ারি একতরফা, প্রহসনের 'ডামি' নির্বাচন করতে চলেছে। এই নির্বাচন কোনও নৈতিক গ্রহণযোগ্যতা পাবে না সূষ্ঠ ও



কিছু কিছু প্রার্থীদের বিজয়ী করতে সরকার, অংশগ্রহণমূলক হবে না তাই বিরোধীদের চাওয়া প্রশাসন ও বিভিন্ন সরকারি সংস্থার প্রকাশ্যে নির্লজ্জ মতো নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচন ভূমিকা নির্বাচনকে হাস্যপরিহাসের বিষয়ে পরিণত দিতে হবে।

নির্বাচন কমিশন অভিমুখে বাম জোটের মিছিলে পুলিশি বাধা তামাশার নির্বাচন বর্জনের আহ্বান



একতরফা নির্বাচনী তফসিল বাতিল, সরকার ও আজীবন নির্বাচন কমিশনের পদত্যাগ, নির্বাচনকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচন এবং সভা-সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে নির্বাচন কমিশন অভিমুখে ১৭ ডিসেম্বর বাম গণতান্ত্রিক জোটের মিছিল পল্টন মোড় থেকে শুরু হয়ে প্রেসক্লাব-হাইকোর্ট এলাকায় কদম ফোয়ারার মোড়ে পুলিশের বাধাপ্রাপ্ত হয়। এসময় নেতাকর্মীদের সাথে পুলিশি মারমুখী আচরণ করে। পুলিশি বাধার মুখে নেতাকর্মীরা সেখানে রাস্তায় বসে অবস্থান নেন ও সমাবেশ করেন।

সম্পদহীন জনগণ আর সংসদ সদস্যদের সম্পদের পাহাড়

বাংলাদেশে সংসদ সদস্যের দায়িত্ব কী, ভূমিকা কী তা এখন আলোচনার কোন বিষয়ই নয়। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ক্ষমতার পট পরিবর্তন হয় ফলে এই নির্বাচনে জিততে হবে যে কোন কৌশলে। কজা করতে হবে রাষ্ট্র ক্ষমতা ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ। ফলে চলে মারমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কিন্তু সংসদ নির্বাচন এলে সংসদ সদস্য প্রার্থীরা যেভাবে জনগণের সেবা করার আকুতি প্রকাশ করেন তা বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোথাও এত তীব্রভাবে প্রকাশ করা হয় কিনা তা যেমন জানা নেই আর সেবা করার আড়ালে শোষণটাও এত তীব্রভাবে কোথাও হয় কিনা সেটাও জানা নেই। বাংলা ভাষায় একটা প্রবাদ আছে, ‘আঙুল ফুলে কলাগাছ’। কিন্তু আঙুল আর কলাগাছের তুলনা করে বোঝানো যাবে না সংসদ সদস্যদের সম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণ। কারণ বুড়ো আঙুলের পরিধি তিন ইঞ্চি আর কলাগাছের পরিধি মোটামুটি ৪৮ ইঞ্চি। বুড়ো আঙুলের তুলনায় কলাগাছ ১৬ গুণ মোটা। ভাবুন দেখি, হলফনামায় উল্লেখ অনুযায়ী সম্পদ বৃদ্ধি কত গুণ? কলাগাছ কি পাত্তা পাবে এই বৃদ্ধির হারের কাছে? তাই প্রশ্ন জাগে, সংসদ সদস্য হলে কি এমন যাদুমন্ত্র শিখে যান বা আলাদিনের চেরাগ পেয়ে যান যে সম্পদের পাহাড় তৈরি করতে পারেন। রূপকথার গল্পকে হার মানিয়ে স্বল্প সময়ে খুবই স্মার্টভাবে সম্পদ বাড়ানোর যে নজির প্রার্থীদের নিজেদের দেয়া হলফনামায় উঠে এসেছে তা সত্যিই বিস্ময়কর। সবকিছুকে গড় করে দেখানো পরিসংখ্যানের কাজ। গড়ের নিচে যেমন মানুষ থাকে তেমনি গড়ের উপরেও থাকে। যদি দেখা যায় গড়ের উপরে সামান্য মানুষ আর গড়ের নিচে বিপুল মানুষ তাহলে বুঝতে হবে বৈষম্য চরমে উঠেছে। দেশে বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মানুষ সত্ত্বেও বাংলাদেশ যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে তা সংসদ সদস্যদের হলফনামা দেখলে আর কারও অবিশ্বাস করার কারণ থাকবে না।

ক্ষমতায় থাকাকালীন মন্ত্রীরা উন্নয়নের কথা বলতে পছন্দ করতেন। তাদের কেউ বলেছেন, তাদের শাসনামলে বাংলাদেশের জনগণ অন্যান্য দেশের তুলনায় যেন বেহেশতে বসবাস করেন, কেউ আবার বলেছেন, দেশের অনেকেই এখন ইউরোপের মানে জীবনযাপন করেন, কেউ আবার বলেছেন, তার এলাকার মেয়েরা দিনে তিনবার লিপস্টিক আর চারবার স্যাডেল পাল্টান। আসলে প্রত্যেকেই তার অবস্থান অনুযায়ী কথা বলে থাকেন। সাধারণ মানুষ তাদের কথায় অবাক হয়েছিল, এখন সম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণ দেখে অবাক না হয়ে ভাবছেন ক্ষমতার এতো ক্ষমতা যে ক্ষমতাসীনদের সম্পদ বাড়ে সব নিয়ম ভেঙেচুরে। তাদেরকে ধরার কেউ নেই কিন্তু তাদের প্রতিপত্তি দেখে ভয় পায় অনেকেই।

এ কথা হলফ করে বলা যায় যে, হলফনামায় সম্পদের পরিমাণ যা উল্লেখ করা হয় প্রকৃত সম্পদ তার চাইতে অনেক বেশি থাকে। এই সম্পদের সামান্য অংশই প্রকাশ্য বেশিরভাগটাই গোপন। আবার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলফনামায় দেশের বাইরে তাদের যে সম্পদ আছে তা উল্লেখ করেননি। যেমন এক মন্ত্রীর লন্ডনে আটটি কোম্পানি আছে কিন্তু তিনি তা উল্লেখ করেননি। কোম্পানিগুলোর সম্পদমূল্য ২০ কোটি ৩১ লাখ ব্রিটিশ পাউন্ড, বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ ২ হাজার ৮৪০ কোটি টাকা। এ নিয়ে নির্বাচন কমিশন ও দুদকের কোন তৎপরতাই দৃশ্যমান নয়। তবে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউটস ইউনিটের (বিএফআইইউ) একজন কর্মকর্তা পত্রিকাকে জানিয়েছেন, অনুমোদন ছাড়া বিদেশে বিনিয়োগ করা বেআইনি। নির্বাচনের পর তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন। ফলে অনুমান করার অনেক কারণ আছে যে, এরকম ঘটনা আরও আছে। তারপরও হলফনামাকে একটি প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। আসন্ন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারীদের হলফনামা বিশ্লেষণ করে টিআইবি যে তথ্য জানিয়েছে তা থেকে বেরিয়ে আসে ক্ষমতার রাজনীতি এবং লুটপাটের অর্থনীতির এক উৎকট প্রদর্শনী। কমপক্ষে ২০ জন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর আয় গত পাঁচ বছরে নজিরবিহীনভাবে বেড়েছে। সর্বোচ্চ আয় বেড়েছে বাণিজ্যমন্ত্রীর, শতাংশের হিসেবে ২ হাজার ১৩১ শতাংশেরও বেশি। আর যার আয় সবচেয়ে কম বেড়েছে, তিনি হলেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রীর, সেটাও কম নয়, ১৩২ শতাংশেরও বেশি। গত ১৫ বছরে আটজন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর সম্পদও সীমাহীনভাবে বেড়েছে। এতে শীর্ষে আছেন খাদ্যমন্ত্রী। ব্যবসা বাণিজ্য, দ্রব্যমূল্য, সিডিকেট, খাদ্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুতের দুর্নীতি ও দাম বৃদ্ধি এসব মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুললেও এইসব মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের দায় কতখানি, জবাবদিহি কতটা ছিল তা আলোচনা করার চাইতে সম্পদ বিবরণী দেখে মানুষ আলোচনা করছে, তারা কত সম্পদের মালিক আর কেমন করে তারা সম্পদশালী হলেন? ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে নির্বাচনে যারা প্রার্থী হয়েছিলেন তাদের ৯২.৮৩ শতাংশই ছিল কোটিপতি। ২৬৫ জন প্রার্থীর গড়ে আয় দেখিয়েছে ২ কোটি ১৪ লাখ টাকা, তাদের গড়ে সম্পদমূল্য ২৮ কোটি টাকার বেশি। ১৭০ জন লিখেছেন তাদের পেশা ব্যবসা। শতাংশের হিসেবে দাঁড়ায় ৬৪.১৫ শতাংশ। এরপর আয় ও সম্পদ বেশি স্বতন্ত্র প্রার্থীদের। ৪৩৩ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে ৩০২ জন ব্যবসায়ী অর্থাৎ ৬৯.৭৫ শতাংশ। এরপর জাতীয় পার্টির ২৬২ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৭৩ জন অর্থাৎ ৬৬ শতাংশ ব্যবসায়ী। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ক্ষমতায় যাওয়া আর ক্ষমতার আশেপাশে থাকা মানুষেরা বেশিরভাগই ব্যবসায়ী। চলতি দ্বাদশ সংসদে ব্যবসায়ী ১৯৯ জন অর্থাৎ সাংসদের ৬৭ শতাংশ।

মন্ত্রীদের আয় বৃদ্ধি এবং জনগণের দুর্ভোগ বৃদ্ধির মধ্যে সম্পর্ক আছে কী? গত ১৫ বছরে সবচেয়ে বেশি সম্পদ বেড়েছে খাদ্যমন্ত্রীর ৬ হাজার ৩৫০ শতাংশ, আর খাদ্যের দাম বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের জীবনে কষ্ট বেড়েছে। বিবিএস এর জরিপ বলছে মানুষ এখন খাওয়া কমিয়েছে। গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর সম্পদ বেড়েছে ২ হাজার ৮৫৮ শতাংশ এবং গণশিক্ষার বেহাল দশা। বস্ত্র ও পাটমন্ত্রীর সম্পদ বেড়েছে ২ হাজার ৭০৩ শতাংশ, সর্বশেষ ২৫টি রাষ্ট্রীয় পাটকল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রীর সম্পদ বেড়েছে ২ হাজার ১৭৯ শতাংশ, বাংলাদেশের প্রবাসী শ্রমিকদের বিদেশ যাওয়ার খরচ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি, বিদেশে তাদের লাঞ্ছনা ও কষ্টের শেষ নেই। শিল্পমন্ত্রীর সম্পদ বেড়েছে ৯৮২ শতাংশ, শিল্প শ্রমিকদের দুর্দশাও বেড়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সম্পদ বৃদ্ধি ৭৮৩ শতাংশ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল দশা। শিল্প প্রতিমন্ত্রীর সম্পদ বেড়েছে ৪৯৩ শতাংশ, ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর সম্পদ বেড়েছে ১২৯ শতাংশ, সারাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের পরিস্থিতির উন্নতি কোথায়?

প্রার্থীদের মধ্যে শতকোটি টাকার চেয়ে বেশি সম্পদের মালিক আছেন ১৮ জন। তাদের ১০ জন আওয়ামী লীগের এবং বাকি ৮ জন দলটির স্বতন্ত্র প্রার্থী। স্বতন্ত্ররাও আবার রাজনৈতিক পরিচয়ে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী। শতকোটি টাকার বেশি সম্পদশালীদের মধ্যে শীর্ষে আছেন এক মন্ত্রী। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ১ হাজার ৩৪৫ কোটি ৭৭ লাখ টাকা। তার পরেই আছেন আরও কয়েকজন।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) আয়োজিত ‘নির্বাচনী হলফনামার তথ্যচিত্র : জনগণকে কী বার্তা দিচ্ছে?’ শিরোনামে সংবাদ সম্মেলনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের দেওয়া হলফনামার তথ্য বিশ্লেষণ করে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

এতে দেখা যায়, গত ১৫ বছরে অনেক মন্ত্রী-এমপির সম্পদ বৃদ্ধির চিত্র রূপকথার গল্পকেও হার মানিয়েছে। আসলেই রাষ্ট্রক্ষমতা ও সম্পদের মেলবন্ধনে বাস্তব সম্পদ অর্জনকারীরা হার মানিয়েছে কল্পনাকে।

যদি ধরেই নেয়া হয় যে, হলফনামায় দেওয়া সম্পদ বিবরণী সঠিক এবং আয় ও সম্পদ বৈধ তাহলে প্রশ্ন উঠা কি সঙ্গত নয় যে কীভাবে এই সম্পদ অর্জিত হলো? প্রদত্ত তথ্য যাচাই করার দায়িত্ব আসলে কার? নির্বাচন কমিশন, রাজস্ব বিভাগ কিংবা দুর্নীতি দমন কমিশন কি তথ্য যাচাই করে, নাকি প্রার্থী হলফনামায় যা উল্লেখ করে সেটাকেই সত্য বলে গ্রহণ করে? ফলে তথ্য নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠে। যেমন, সম্পদের অর্জনকালীন যে মূল্য দেখানো হয়েছে, তা সঠিক কিনা? প্রার্থীরা তাদের অর্জিত সম্পদের কতটা দেখিয়েছেন অথবা বিদেশে সম্পদ থাকা তার তথ্য গোপন করেছেন কিনা ইত্যাদি। প্রশ্নগুলো আপাতত তুলে রেখেও টিআইবির প্রতিবেদনে মন্ত্রী-এমপি প্রার্থীর সম্পদের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। আবার অনেক মন্ত্রী-এমপি, প্রার্থীর বিশাল পরিমাণ ঋণও রয়েছে। যেমন, একজন প্রার্থীর ৪২১ কোটি টাকার সম্পদ থাকলেও তাঁর ঋণ ও দায় রয়েছে প্রায় ২ হাজার ৫৩৮ কোটি টাকার। আর এক প্রার্থীর ঋণ আছে ২ হাজার ৭ কোটি টাকা। আর একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষিত হতে পারে। এবারের নির্বাচনে অন্তত দশজন প্রার্থী শত বিঘার বেশি কৃষি জমির মালিক। অথচ বাংলাদেশের ভূমি আইন অনুযায়ী, একজন ব্যক্তির সর্বোচ্চ ৬০ বিঘা কৃষিজমি থাকার বিধান রয়েছে। কিশোরগঞ্জ-৩ আসনের এক প্রার্থীর জমির পরিমাণ ৬৪৭ একর। বগুড়া-২ আসনের প্রার্থীর ৫৪৮ একর, ময়মনসিংহ-৪ আসনের প্রার্থীর ১৯৫ একর, বাগেরহাট-৪ আসনের প্রার্থীর ১১০ একর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসনের প্রার্থীর ৮৩ একর, যশোর-১ আসনের প্রার্থীর ৬৮ একর, চট্টগ্রাম-২ আসনের প্রার্থীর প্রায় ৭০ একর, ঢাকা-১৫ আসনের প্রার্থীর ৬১ একর, ভোলা-১ আসনের প্রার্থীর ৬০ একর ও সুনামগঞ্জ-২ আসনের প্রার্থীর ৫১ একর। এক একর সমান তিন বিঘা। অর্থাৎ ১৯৪১ বিঘা থেকে সর্বনিম্ন ১৫৩ বিঘা জমির মালিক নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। দেখার কেউ কি আছে?

জাতীয় সংসদ নির্বাচন একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। এতে অংশগ্রহণ করে রাজনৈতিক দলসমূহ আর সংসদকে বলা হয় আইনসভা। এখানেই সিদ্ধান্ত হয় দেশ পরিচালনার নীতি ও পদ্ধতি নিয়ে। কৃষি-শিক্ষা, স্বাস্থ্য-বাণিজ্য, বৈদেশিক সম্পর্ক, শিল্প কর্মসংস্থান সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এখানে। ফলে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ এবং রাজনৈতিক। কিন্তু দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতার পর প্রতিটি সংসদে পর্যায়ক্রমে রাজনীতিবিদের সংখ্যা কমছে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১ হাজার ৮৯৬ জন প্রার্থী অংশ নিয়েছিল। এর মধ্যে মূল পেশা বিবেচনায় ব্যবসায়ী ৫৭ দশমিক ৩৪ শতাংশ। এ ছাড়া আইনজীবী ৯ দশমিক ১৭ শতাংশ, কৃষিজীবী ৭ দশমিক ৮১ শতাংশ, চাকরিজীবী ৫ দশমিক ১৬ শতাংশ, শিক্ষক ৪ দশমিক ৯৫ শতাংশ, রাজনীতিবিদ ২ দশমিক ৮৬ শতাংশ। অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ২ দশমিক ৭১ শতাংশ, চিকিৎসক ২ দশমিক ১৯ শতাংশ, সাংবাদিক দশমিক ৮৩ শতাংশ, গৃহস্থালি দশমিক ৬৮ শতাংশ এবং অন্যান্য ৬ দশমিক ৩০ শতাংশ।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বড় পুঁজি যেমন ছোট পুঁজিকে গিলে খায় নির্বাচনেও তেমনি বড় পুঁজিপতিদের কাছে অন্যান্য প্রার্থীরা অসহায়। এবার নির্বাচনে রেকর্ড পরিমাণ কোটিপতি ৫৭১ জন অংশ নিয়েছেন। ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় এসেছিল তখন

কোটিপতি প্রার্থী ছিল ২৭৪ জন আর ২০১৮ সালে ছিল ৫২২ জন। আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের মধ্যে ৮২ শতাংশই কোটিপতি। ডামি প্রার্থীরাও কোটিপতি। ফলে সংসদ পরিচালিত হবে কোটিপতিদের দ্বারা, কোটিপতি অধ্যুষিত এবং কোটিপতিদের স্বার্থে, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হয়েছে কিনা সেই বিতর্ক করার অবকাশ নেই। আমি বনাম ডামি কিংবা আওয়ামী লীগ বনাম স্বতন্ত্র লীগের এই নির্বাচনে ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু এ ধরনের একটি নির্বাচনেও টাকার খেলা, পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা নির্বাচনকে প্রভাবিত করেছে। এর কারণ কী? পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রাষ্ট্র ক্ষমতা পুঁজিপতিদের স্বার্থেই ব্যবহৃত হবে একথা এখন আর কোন তাত্ত্বিক আলোচনা নয়। বাস্তবেই একের পর এক নির্বাচন কী প্রমাণ করছে না, যে ক্ষমতায় গিয়ে সম্পদ বৃদ্ধি করা এবং সম্পদশালীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার পদ্ধতি খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ১৯৭৩ সালের প্রথম জাতীয় সংসদে ১৮ শতাংশ ব্যবসায়ীর উপস্থিতি ছিল আর ২০২৪ সালে ব্যবসায়ীদের অংশ দাঁড়ালো ৬৭ শতাংশে। সংসদ যে আজ আর জনগণের প্রতিনিধিদের প্রতিষ্ঠান নাই, কোটিপতিদের ক্লাবে পরিণত হয়েছে তা দিব্য চোখে দেখা যাচ্ছে। ব্যবসায়ী আর পুঁজিপতিদের সম্পদ বৃদ্ধি এবং সংসদে ক্ষমতা বৃদ্ধি যে একইসাথে ঘটেছে সংসদ নির্বাচন অংশগ্রহণকারীদের হলফনামার বিবরণী যেন তারই একটা দলিল হয়ে রইলো।

ব্যটোরিচালিত রিকশা বন্ধের সিদ্ধান্ত বাতিল কর

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

খুলনা নগরীতে প্রায় ৩০ হাজার রিকশাচালক-মালিক ও তাদের পরিবার এবং সংশ্লিষ্ট কয়েক হাজার শ্রমিক, গ্যারেজ মালিক, যন্ত্রাংশ ব্যবসায়ী, প্রস্তুতকারী এবং তাদের পরিবার বসবাস করে। সাম্প্রতিক সময়ে খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ব্যাটারিচালিত রিকশা বন্ধ করা এবং ব্যাটারি ও মোটর খুলে নেয়া ও ভেঙে ফেলা হচ্ছে। এতে হাজার হাজার শ্রমিক ও মালিক আর্থিকভাবে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের শর্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। বর্তমানে মানুষের কাজের এবং জীবনের গতিও বেড়েছে। ফলে ধীরগতির বাহনের চাহিদা কমছে, পায়ে চালিত রিকশার পরিবর্তে ব্যাটারিচালিত রিকশার চাহিদা বেড়েছে। ব্যাটারিচালিত রিকশার সুবিধার কারণে যাত্রীরা এখন এই বাহনে চড়তে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। ২৪ ঘণ্টার যেকোনো সময়ে যেকোন বিপদে-আপদে এবং অলিগলির যেকোন স্থান থেকে নাগরিকরা এই বাহনের সহযোগীতা নিতে পারেন। এই বাহনের কারণে গভীর রাতেও যথাসময়ে হাসপাতালে পৌঁছাতে পারে, সুতরাং ব্যাটারিচালিত রিকশা বন্ধ করে দিলে এর সুবিধাভোগী অসংখ্য মানুষও সমস্যায় পতিত হবেন। ফলে রিকশাতে ব্যাটারি ও মোটর লাগিয়ে আধুনিকায়ন করে শ্রমিকরা তাদের আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করছে। সে আয় দিয়ে তারা পরিবার চালায় রাষ্ট্রকে ভ্যাট-ট্যাক্স দেয়। ফলে এই রিকশা বন্ধ হলে দেশের অর্থনীতিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নেতৃবৃন্দ বলেন, এই রিকশা বন্ধ নয় আধুনিকায়ন করে রেজিস্ট্রেশন ও চলাচলের নীতিমালা করার জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব করেছি। নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নিবন্ধন, রুট পারমিট, লাইসেন্স দেয়ার ব্যবস্থা চালু হলে সড়কে শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। তাই ব্যাটারিচালিত রিকশা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাতিল করার দাবি জানাচ্ছি।

শিক্ষাক্রম-২০২১ স্থগিত করে সংশ্লিষ্টদের মতামতের ভিত্তিতে নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন কর

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট

শিক্ষাক্রম ২০২১ স্থগিত করে ছাত্র-শিক্ষক, শিক্ষাবিদসহ অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে ক্রটি সংশোধন করে নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, শিক্ষাখাতে জিডিপি ৬ শতাংশ বরাদ্দ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অবকাঠামোগত আয়োজন নিশ্চিত করা, সন্ত্রাস-দখলদারিত্বমুক্ত শিক্ষার গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করাসহ ৫ দফা দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে ২০ ডিসেম্বর '২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল পরবর্তী রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুক্তা বাউড়ের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিনের পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সাংগঠনিক সম্পাদক সুহাইল আহমেদ শুভ, দপ্তর সম্পাদক অনিক কুমার দাস, অর্থ সম্পাদক সুলতানা আক্তার।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, শিক্ষাক্রম কারিকুলাম পরিবর্তন একটা মৌলিক বিষয়। এটা করতে হলে দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যাচাই-বাছাই করে অংশীজনের মতামত গ্রহণ ও গবেষণার মাধ্যমে তা ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষা কারিকুলাম ২০২১-



এর ক্ষেত্রে এসব কিছুই দেখা যাচ্ছে না। উপরন্তু পুরো শিক্ষাক্রম একসাথে পরিবর্তন করার উদ্যোগ নিয়েছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, এই শিক্ষাক্রম রূপরেখার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য বাড়বে। মৌলিক বিষয়ের গুরুত্ব কমিয়ে জীবন-জীবিকা বা তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষাকে

কারিগরীকরণের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। প্রস্তুতি এবং পর্যাপ্ত আয়োজন ব্যতিরেকে এই শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের চেষ্টা হবে আত্মঘাতী। নেতৃবৃন্দ বলেন, শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়তে হবে, ছাত্র-শিক্ষক, শিক্ষাবিদসহ অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে ক্রটি সংশোধন করে নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বিজয়ের মাসে মানুষ বিজয় উদযাপন করার পরিবর্তে একটা ভয়ংকর আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। এই মাসেই পাহাড়ে পিসিপি সাবেক সভাপতি বিপুল চাকমাসহ ৪ জনকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। পাহাড়ে হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ এবং জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে সঠিক বিচারের দাবি জানিয়ে বলেন, সারাদেশে আওয়ামী লীগ সরকারের ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের কবলে পতিত হয়েছে খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মেহনতি মানুষ। কোনো প্রকার জনমতের তোয়াক্কা না করে সরকার ৭ জানুয়ারি একটি একদলীয় সাজানো সার্কাস নির্বাচনের আয়োজন করতে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ। এই নির্বাচন জনগণের কাছে কোন গ্রহণযোগ্যতা পাবে না।

নেতৃবৃন্দ জনগণের শিক্ষা-স্বাস্থ্য, খাদ্যের নিরাপত্তা না দিয়ে তাদের একদলীয় শাসন দীর্ঘায়িত করার পায়তারা করছে। ভিন্নমত, দলের উপর নির্বিচারে হামলা-মামলা করে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে। শিক্ষাক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করা, সন্ত্রাস-দখলদারিত্ব বন্ধ করাসহ সম্প্রতিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃত্বের উপর হামলার নিন্দা জানান।

জাতীয় ন্যূনতম মজুরিসহ সর্বক্ষেত্রে ন্যায্য মজুরি বাস্তবায়ন চাই শ্রমিক সংগঠনসমূহের প্রস্তাবনা অনুযায়ী শ্রম আইন সংশোধন কর

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ন্যায্য মজুরি, গণতান্ত্রিক শ্রম আইন, নিপীড়ন ও হয়রানিমুক্ত নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সামাজিক সুরক্ষা এবং অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন চর্চার সুযোগ

সাইফুজ্জামান বাদশা, জাতীয় শ্রমিক জোটের কার্যকরী সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, শ্রমিক ফ্রন্টের সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদুজ্জামান লিপন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক জুলফিকার আলী, অর্থ সম্পাদক আবু নাঈম খান বিপ্লব।

নেতৃবৃন্দ বলেন, শ্রমিক ফ্রন্ট তার প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে শ্রমিকদের ন্যয়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন পরিচালনা করে যাচ্ছে। এর মধ্যদিয়ে

স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরেও শ্রমিকদের যে মজুরি নির্ধারিত হয় তা তাদের জীবনের প্রয়োজনের বিবেচনায় নয়, মালিকদের ইচ্ছা অনুসারে। শ্রম আইন প্রণয়ন করা হয় শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য নয় বরং শ্রমিকদের আইনের ফাঁদে বেঁধে মালিকদের শোষণকে নির্বিল্ল করার জন্য। সরকার আইএলও এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নকে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও চর্চা প্রক্রিয়া সহজীকরণসহ শ্রম পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য শ্রম আইন সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং সেই প্রতিশ্রুতি পালনের উদ্যোগ দেখানোর জন্য গত ২ নভেম্বর ২০২৩ শ্রম আইনের সংশোধনী পাশ করা হয়েছিল যা মহামান্য রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর না করে ২০ নভেম্বর ২০২৩ সংসদে ফেরত পাঠিয়েছে। শ্রম আইনের এই সংশোধনিত শ্রমিকদের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়নি। এই আইনে শ্রমিকদের সুরক্ষার আওতা বৃদ্ধি, অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন চর্চার সুযোগ, চাকরির নিরাপত্তা, চাকরির অবসানে শ্রমিকদের ন্যায্য গ্রাচুইটি পাওয়ার নিশ্চয়তা, বিভিন্ন অপকৌশলের মাধ্যমে শ্রমিকদের চাকরি থেকে অব্যাহতি প্রদানের সুযোগ বন্ধ, কর্মস্থলে শ্রমিকদের প্রাণহানি বন্ধ ও ক্ষতিপূরণের মাত্রা বৃদ্ধি, জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনও দাবিই পূরণ করা হয়নি। শ্রম আইনে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করার কথা বললে যদি ত্রিপক্ষীয় মতামতের অজুহাত তোলা হয় তাহলে শ্রমিক স্বার্থের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে শ্রমিক পক্ষের প্রকৃত মতামত গ্রহণ করা হয় কি? শ্রম আইন হতে হবে শ্রমিকদের শ্রমাদিকারের সুরক্ষার রক্ষাকবচ হিসেবে। তাই শ্রম আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনী যা পূর্বের সংসদে পাশ হয়েছিল তা সম্পূর্ণ বাতিল করে শ্রমিক সংগঠনসমূহের উত্থাপিত দাবিসমূহকে অগ্রাধিকার দিয়ে শ্রম আইনকে সংশোধন করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, নিত্যপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারণে প্রতিটি খাতের শ্রমিকদের জীবনমান প্রতিনিয়ত নিচের দিকে

নামছে। মূল্যস্ফীতির গড় হার প্রায় ১০ শতাংশ আর খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি আরও বেশি। সরকার মুখে স্বীকার করছে যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে শ্রমজীবী মানুষের কষ্ট হচ্ছে কিন্তু সেই কষ্ট লাঘবে শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানোর কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না।

নেতৃবৃন্দ জাতীয় ন্যূনতম মজুরিসহ সর্বক্ষেত্রে নিত্যপণ্যের বাজারদরের সাথে সঙ্গতি রেখে মজুরি পুনর্নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের দাবি জানান।

নেতৃবৃন্দ, এস কিউ গার্মেন্টসে গত ১০ জানুয়ারি থেকে কয়েক দিনে ৪ জন শ্রমিক নিহত এবং অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হওয়ার ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করার এবং নিহত শ্রমিকদের পরিবারকে আজীবন আয়ের মানদণ্ডে ক্ষতিপূরণ প্রদানের আহ্বান জানিয়ে বলেন, সরকার কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা এখনো নিশ্চিত করতে পারেনি। দেশের মানব সম্পদের ব্যবস্থাপক হিসাবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হওয়ার কথা রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। অথচ রাষ্ট্রের সবচেয়ে অবহেলিত মন্ত্রণালয় হিসাবে গণ্য হয় এই মন্ত্রণালয়। তারপর রয়েছে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরসমূহের দুর্নীতি যা মজুরির জন্য এসে মৃত্যুর মিছিল থামাতে ব্যর্থ হচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ শ্রম আইনের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন ১২১ অনুসারে এবং আইএলও কনভেনশন ১৯০ অনুস্বাক্ষর করে সেই আলোকে আইন সংশোধন করে নির্ধারিত, হয়রানিমুক্ত, নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, শ্রমিকদের অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিত করা ছাড়া শোভন কাজ আর এস.ডি. জির গল্প প্রতারণামূলক। নেতৃবৃন্দ শোষণমূলক পুঁজিবাদী সমাজ ভেঙে শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্র গড়ে তোলার আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, দেশের বিভিন্ন জেলা—চট্টগ্রাম, বরিশাল, গাজীপুর, কোনাবাড়ী গাজীপুর, সিলেট, দিনাজপুর, রংপুর, কুষ্টিয়া, সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাট, বগুড়া জেলায় শ্রমিক ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়।



নিশ্চিত করার দাবিতে ১৯ জানুয়ারি '২৪ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট শ্রমিক সমাবেশ ও মিছিলের কর্মসূচি পালন করে।

শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ওসমান আলী, জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশের সভাপতি

এই সংগঠন শ্রমিকশ্রেণির কাছে একটা বিশিষ্টতা অর্জন করেছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে এই দেশের মানুষ লড়াই করেছিল শোষণমুক্ত সমাজের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। কিন্তু স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরেও দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তীব্র বৈষম্যের শিকার, যা দিনে দিনে বেড়েই চলছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুবিধাভোগী লুটেরা পুঁজিপতিশ্রেণি সংসদে বসে নিজেদের স্বার্থে আইন প্রণয়ন করে ও রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ করে। সেজন্য

যানজট-জলাবদ্ধতা, দুর্ঘটনা থেকে বরিশালবাসীকে রক্ষার দাবি

বাসদ বরিশাল জেলা

যানজট, জলাবদ্ধতা-দুর্ঘটনা, থেকে বরিশালবাসীকে রক্ষা করার দাবিতে ১০ ডিসেম্বর অশ্বিনী কুমার হলচন্দ্রে বাসদের উদ্যোগে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ বরিশাল জেলার সমন্বয়ক ডা. মনীষা চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলার সদস্য দুলাল মল্লিক, সাধারণ নাগরিক সমাজের আহ্বায়ক কাজী মিজানুর রহমান, বরিশাল নগর উন্নয়ন ফোরামের সমন্বয়ক কাজী এনায়েত হোসেন শিপলু, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-

মহাসড়ক, দুই লেনের সরু রাস্তা ও রাস্তায় নানবিধ অবৈধ স্থাপনা এসব দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। নেতৃবৃন্দ বরিশালের সকল ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট সংস্কার, রূপান্তরী থেকে গাড়িয়ার পাড় বাইপাস সড়ক নির্মাণ, মহাসড়কে সার্ভিস রোড নির্মাণ, দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা চিহ্নিত করে তা সমাধানে কার্যকর সমাধান করা, গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ট্রাফিক সিগনাল, ব্যাটারিচালিত যানবাহনের জন্য আলাদা পার্কিং স্ট্যান্ড ও ওভারব্রিজ নির্মাণ করার দাবি জানান। একইসাথে নেতৃবৃন্দ চৌমাথায় অবৈধ পার্কসহ মহাসড়ক থেকে সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করার দাবি জানান। নেতৃবৃন্দ জলাবদ্ধতা নিরসনে শুধু লোক দেখানো খালের পাড় পরিষ্কার



সিপিব জেলা শাখার সভাপতি অধ্যক্ষ মিজানুর রহমান সেলিম, মহাসড়কে দুর্ঘটনায় নিহত মেডিকেলের শিক্ষার্থী তৌফিকের স্বজন অ্যাড. আলাউদ্দিন হাওলাদার, আহত ইজিবাইক চালক মিজানুর রহমানের স্বজন রুমি বেগম, বাসদ জেলা শাখার সদস্য শহিদুল ইসলাম, শ্রমিক ফ্রন্টের নেতা শহিদুল ইসলাম, ছাত্র ফ্রন্ট বরিশাল মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক সূজন শিকদার, রিকশা-ব্যাটারিচালিত রিকশা-ভ্যান, ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদের জেলা সংগঠক রমজান আকন, সভা পরিচালনা করেন বাসদ জেলা সদস্য বিজন শিকদার।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বরিশালের মহাসড়কে গত ২৮ নভেম্বর '২৩ একজন মেডিকেল শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। পদ্মা সেতু চালু হবার পর থেকে এপর্যন্ত বরিশালের মহাসড়কে দুর্ঘটনায় শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। বরিশালের অপ্রশস্ত

নয়, মাস্টারপ্লান অনুযায়ী সকল খাল পুনরুদ্ধার ও পুনর্নব্বনের দাবি জানান।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, কাশিপুর, মড়কখোলার পোলসহ বিভিন্ন জায়গায় ইজিবাইক শ্রমিকদের কাছ থেকে বিটবাগিজ্য করার জন্য সন্ত্রাসীরা চেষ্টা চালাচ্ছে। নেতৃবৃন্দ এই অপতৎপরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানান ও এই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য প্রশাসনের প্রতি আহবান জানান। নেতৃবৃন্দ একইসাথে সরকার ঘোষিত নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাটারিচালিত যানবাহনের BRTA স্বীকৃত লাইসেন্স দেয়ার দাবি জানান।

সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে একটি প্রতিনিধিদল বরিশাল জেলা প্রশাসক ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বরাবর স্মারকলিপি পেশ করে।

৪ ইউপিডিএফ নেতাকর্মী হত্যা ও অপহরণের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ১২ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে ১১ ডিসেম্বর '২৩ খাগড়াছড়ির পাড়ায় সন্ত্রাসীরা ব্রাশ ফায়ার করে পিসিপি'র সাবেক সভাপতি বিপুল চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সুনীল কান্তি ত্রিপুরা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের লিটন চাকমা ও ইউপিডিএফ সদস্য রুহিন বিকাশ ত্রিপুরাকে হত্যার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

কমরেড ফিরোজ এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িতদের গ্রেপ্তার ও বিচার দাবি করেন এবং অপহরণকৃতদের উদ্ধারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জোর তৎপরতার দাবি জানান। একই সাথে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বাভী সংঘাতে না

জড়িয়ে এবং শাসক বুর্জোয়া শ্রেণির রাজনৈতিক দলের ক্রীড়নকে পরিণত না হয়ে পাহাড়ি আদিবাসীদের অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামকে জোরদার করুন।

উল্লেখ্য, খাগড়াছড়ির পানছড়িতে নিহতের শেষকৃত্যে বাসদের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট

ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুক্তা বাউড় ও সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন খাগড়াছড়ির বিপুল চাকমা, সুনীল কান্তি ত্রিপুরা, লিটন চাকমা, রুহিন বিকাশ ত্রিপুরাসহ ৪ জনকে নৃশংসভাবে হত্যার তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

শ্রম আইন সংশোধন করে প্রাইভেট কার মাইক্রোবাস চালকদের শ্রমাদিকার নিশ্চিত কর



প্রাইভেট কার, মাইক্রো চালকসহ সকল অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকের গণতান্ত্রিক শ্রম আইনের অধিকার নিশ্চিত করা এবং হালকা যানবাহন চালকদের ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবিতে ১৯ জানুয়ারি '২৪, ঢাকা, বিজয়নগর পানির ট্যাংকি থেকে জাতীয় প্রেসক্লাব অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল করে 'ঢাকা জেলা ট্যাক্সি, ট্যাক্সি কার, অটোটেম্পু, অটোরিকশা চালক শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজি : নং: ঢাক-২২৮০)

'। ইউনিয়নের সভাপতি নজরুল ইসলাম বাবলুর সভাপতিত্বে মিছিল পূর্ব সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কার্যকরী সভাপতি বিরেশ চন্দ্র দাস, সহসভাপতি আলমগির হোসেন, যুগ্মসম্পাদক রফিকুল ইসলাম রফিক, সহসম্পাদক হাবিবুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক রুবেল মিয়া, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মোশারোফ হোসেন, দপ্তর সম্পাদক শফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

বিভিন্ন জেলায় বেগম রোকেয়া দিবস পালিত



নারীমুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়ার ১৪৩তম জন্ম ও ৯১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম ঢাকা, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, মাগুরা, নওগাঁ, চাঁদপুর, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় শ্রদ্ধা নিবেদন, র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বেগম রোকেয়ার রচনা থেকে

স্বীকার করি যে, শারীরিক দুর্বলতা বশত, নারীজাতি আপনার জাতির সাহায্যে নির্ভর করে। তাই বলিয়া পুরুষ 'প্রভু' হইতে পারে না। কারণ জগতে দেখিতে পাই, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিকট কোনো না কোনো প্রকার সাহায্য প্রার্থনা করে, যেন একে অপরের সাহায্য ব্যতীত চলিতে পারে না। তরুলতা যেমন বৃষ্টির সাহায্য প্রার্থী, মেঘও সেইরূপ তরুল সাহায্য চায়। জল বৃদ্ধির নিমিত্ত নদী বর্ষার সাহায্য পায়, মেঘ আবার নদীর নিকট ঋণী। তবে তরঙ্গিনী কাদম্বিনীর 'স্বামী' না কাদম্বিনী তরঙ্গিনীর 'স্বামী'? এ স্বাভাবিক নিয়মের কথা ছাড়িয়া কেবল সামাজিক নিয়মে দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা তাহাই দেখি। কেহ সূত্রধর, কেহ তন্তুবায় ইত্যাদি। একজন ব্যারিস্টার ডাক্তারের সাহায্য প্রার্থী, আবার ডাক্তারও ব্যারিস্টারের সাহায্য চাহেন। তবে ডাক্তারকে ব্যারিস্টারের স্বামী বলিব, না ব্যারিস্টার ডাক্তারের স্বামী? যদি ইহাদের কেহ কাহাকে 'স্বামী' বলিয়া স্বীকার না করেন, তবে শ্রীমতিগণ জীবনের চিরসঙ্গী শ্রীমানদিগকে 'স্বামী' ভাবিবেন কেন?— অর্ধাঙ্গী প্রবন্ধ

পুরুষদিগকেও বলি—ভাতৃগণ! আমরা স্বাধীন না হইলে তোমরাও স্বাধীন হইবে না। নিশ্চয় জানিও, আমরা যতদিন পরাধীন থাকিব, তোমরাও ততদিন পরাধীন থাকিব। তোমরা আমাদের উপর প্রভুত্ব কর বলিয়া তোমাদের উপর আর এক জাতি আধিপত্য করিতেছে। রোকেয়া রচনাসংগ্রহ পৃ. ৬১৩।

নির্বাচনী তামাশায় কী পেল জনগণ?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বহুদিনের আবেগময় প্রতীকের বিরুদ্ধে প্রচারণা করেছেন, জোটসঙ্গীরা ভোটসঙ্গী হতে পারেননি, তাদেরকেও জোটের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে, নতুন এবং হঠাৎ গজিয়ে উঠা দল, কী এক আশায় আকস্মিক দাঁড়িয়ে যাওয়া নেতারা মাঠে ছিলেন, ভোট চাওয়ার প্রতি আগ্রহ না থাকলেও ক্ষমতাসীন দলের অনুগ্রহ পাবার আকুতি ছিল তাদের। বিরোধী দল কারা হবেন সে ব্যাপারে অনিশ্চয়তা, স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ৬২ জন বিজয়ী হয়েছেন, তাদের সংসদে অবস্থান কী হবে—এ নিয়ে চিন্তা বা দৃষ্টিভঙ্গি তো আছেই সাথে নতুন আশঙ্কা তৈরি করলো। এই দৃষ্টান্ত যদি পরবর্তীতেও ক্ষমতাসীন দল অনুসরণ করতে থাকে তাহলে গণতন্ত্র থাকবে তলানিতে, জনগণকে ভুগতে হবে সমস্ত দিক থেকে আর রাষ্ট্রের চরিত্র হয়ে উঠবে স্বৈরতান্ত্রিক।

এবারের নির্বাচন বিরোধী দলসমূহের বর্জনের পরও ৫৭১ জন কোটিপতি নির্বাচন করেছেন। কিন্তু প্রার্থীদের মধ্যে রাজনীতিবিদের সংখ্যা ছিল মাত্র ২.৮৬ শতাংশ। স্বাধীনতার পর থেকে নির্বাচনে ও সংসদে কোটিপতিদের অংশগ্রহণ বাড়ছে আর রাজনীতিবিদদের সংখ্যা কমছে। তবে এবার তা নতুন রেকর্ড করেছে। যেভাবে টাকাওয়ালারা সংসদ সদস্য হতে আগ্রহী হয়ে উঠছেন তাতে নির্বাচন উৎসবের পরিবর্তে জনগণের কাছে আতঙ্ক আর প্রার্থীদের জনগণের টাকায় আখের গুছানোর প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে। জনমত বা জনচেতনা সৃষ্টির পথ দিনদিন কন্ট্রাকার্কীয় হয়ে পড়ছে।

সংসদ সদস্যগণ সত্য কথা বলবেন এবং সঠিক কাজ করবেন এই প্রত্যাশা নিশ্চয়ই অমূলক নয়। কিন্তু জনগণের ধারণা তারা সম্পদের ব্যাপারে সত্য কথা বলেন না। নির্বাচনের অনিয়ম নিয়ে টিআইবির গবেষণায় দেখা গেছে তফসিল ঘোষণার আগে থেকে নির্বাচন পর্যন্ত প্রার্থীদের গড় প্রচারনা ব্যয় ১ কোটি ৫৬ লাখ ৮৩ হাজার ৭৭৭ টাকা; যা নির্বাচন কশিসনের নির্ধারিত ব্যয়সীমা ২৫ লাখ টাকা থেকে ছয় গুণ বেশি। ফলে নির্ধারিত ব্যয়সীমা লংঘন করে অধিক টাকা ব্যয় করে যারা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে শপথ নিয়ে বললেন আইন ও নিয়ম মেনে নির্বাচন করেছেন এটা ডাহা মিথ্যা কথা। ফলে, শুরুতেই যারা মিথ্যা কথা বলে সংসদে শপথ নিলেন তারা কীভাবে দেশে আইনের শাসন ও নিয়ম পালন করবেন? তারপরও নির্বাচনী হলফনামা অনুযায়ী দ্বাদশ জাতীয় সংসদের সদস্যদের কারও অবৈধ আয় ও সম্পদ থাকলে আইনি প্রক্রিয়ায় বাজেয়াপ্ত করা হলে অন্তত আইনের চোখে সবাই সমান এই কথাটার একটা প্রমাণ থাকতো। দেশের আইনে (ল্যান্ড রিফর্ম অ্যাক্ট, ২০২৩) একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ (কৃষিজমির ক্ষেত্রে ৬০ বিঘা এবং অকৃষি জমিসহ যা ১০০ বিঘা পর্যন্ত যেতে পারে) ভূমির মালিক হতে পারে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ১৩ জন সংসদ সদস্যের কাছে আইনি সীমার বাইরে জমি আছে। এই জমির পরিমাণ ৮০০ একর (৩ বিঘায় ১ একর বিবেচনায়)। এই জমির ব্যাপারে কিছু করার পদক্ষেপ নেয়া হবে কী?

দ্বাদশ সংসদের সদস্যদের নির্বাচনী হলফনামা থেকে দেখা যায়, অস্থাবর সম্পদের ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের প্রায় ৮৫ শতাংশই কোটিপতি (অস্থাবর সম্পদ মূল্যের ভিত্তিতে)। এক শ কোটি টাকার বেশি সম্পদ রয়েছে এমন সংসদ সদস্যের সংখ্যা ১৬ জন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদের সদস্যদের অস্থাবর সম্পদের সম্মিলিত মূল্য প্রায় ২২ হাজার ৭০০ কোটি টাকার বেশি। সর্বশেষ চারটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের গড় অস্থাবর সম্পদের তুলনা করে দেখা গেছে, দশম সংসদের তুলনায় একাদশ সংসদের সদস্যদের সম্পদ বেড়েছে ৭৫ শতাংশের বেশি।

যে সংবিধানের কথা ঘন ঘন উচ্চারিত হয়

ক্ষমতাসীনদের মুখে, সেই সংবিধানে আছে অনুপার্জিত আয় ভোগ করা যাবে না। কিন্তু বিধিবহির্ভূতভাবে অর্জিত এই সম্পদ এবং সম্পদের মালিকদের কী হবে? তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ২০১৮ সালে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তুলনায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সম্পদের বৃদ্ধির হার প্রায় ৭০ দশমিক ৪১ শতাংশ। এই আয় এবং সম্পদের উৎস কী? দেখা যাচ্ছে, নতুন সংসদ সদস্যদের ৬৫ শতাংশই ব্যবসায়ী। যা সর্বশেষ চারটি সংসদের মধ্যে সর্বোচ্চ। নবম জাতীয় সংসদে ৫৬ দশমিক ৮৩ শতাংশ, দশম জাতীয় সংসদে ৫৭ দশমিক ৫৯ শতাংশ এবং একাদশ জাতীয় সংসদে ৬২ শতাংশ সংসদ সদস্যই ছিলেন ব্যবসায়ী। আর স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের সদস্যদের মধ্যে ব্যবসায়ীর হার ছিল ১৮ শতাংশ।

দ্বাদশ নির্বাচনে প্রার্থীদের আয়ের উৎস কী ছিল? ১ হাজার ৯৪৫ জন প্রার্থীর মধ্যে ১ হাজার ১৪২ জনই ছিলেন ব্যবসায়ী (৫৮ দশমিক ৭১ শতাংশ)। আ. লীগের ২৬৫ জনের মধ্যে ১৭০ জন, জাতীয় পার্টির ২৬২ জনের মধ্যে ১৭৩ জন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ৪৩৩ জনের মধ্যে ৩০২ জনই ব্যবসায়ী।

নির্বাচনের পর দেখা যাচ্ছে, ২৯৮ আসনে বিজয়ীদের মধ্যে ব্যবসায়ী ১৯৪ জন। তার মধ্যে আ. লীগের ১৪৫ জন, জাতীয় পার্টির ৯ জন, জাসদের ১ জন, কল্যাণ পার্টির ১ জন এবং স্বতন্ত্র ৩৮ জন রয়েছেন। এর বাইরে আরও অন্তত ৫ জন ব্যবসায়ী নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন সব মিলিয়ে অন্তত ১৯৯ জন ব্যবসায়ী এবার জাতীয় সংসদে সদস্য হিসেবে বসতে যাচ্ছেন। এর বাইরে নির্বাচিত যে ৪০ জন নিজেদের রাজনীতিবিদ ও কৃষিজীবী হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকের মূল পেশা ব্যবসা।

সংসদে ব্যবসায়ী বাড়ছে, কমছে কারা? রওনক জাহান তাঁর বাংলাদেশ পলিটিকস : প্রবলেমস অ্যান্ড ইস্যুজ বইয়ে লিখেছেন, প্রথম জাতীয় সংসদে সাড়ে ২৫ শতাংশ আইনজীবী, ২৩ দশমিক ৬৭ শতাংশ ব্যবসায়ী, ১৪ দশমিক ৮৪ শতাংশ কৃষক, শিক্ষক ৯ দশমিক ৮৯ শতাংশ এবং ১২ দশমিক ৩৬ শতাংশ রাজনীতিবিদ ছিলেন। ১৯৯১ সালে পঞ্চম সংসদে ব্যবসায়ীদের হার বেড়ে ৩৮ শতাংশ হয়। আর ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত একাদশ সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী ৩০০ জন সদস্যের মধ্যে ৬২ শতাংশই ছিলেন ব্যবসায়ী। বাকিদের মধ্যে আইনজীবী ১৪ শতাংশ, কৃষিজীবী ৪ শতাংশ এবং রাজনীতিবিদ ছিলেন ৭ শতাংশ। ফলে রাজনীতিবিদরা সংসদে কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন। রাজনীতির ব্যবসায়িকরণ যেমন হয়েছে, ব্যবসায়ীদের রাজনীতিকরণও তেমনি বিস্তৃত হয়েছে।

ফলে রাষ্ট্রের নীতিকাঠামো দখল হয়ে যাচ্ছে। ব্যাংকিং, পোশাকশিল্প বা বিদ্যুতের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে ব্যবসায়ীরা ঠিক করছেন নীতিকাঠামো কী হবে। গত জাতীয় সংসদে ব্যাংকিং কোম্পানি আইনে যে সব পরিবর্তন আনা হয়েছিল, তা মন্ত্রিসভার বৈঠকেও প্রস্তাব করা হয়নি। সংশোধিত আইনে ব্যাংক মালিকদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। ঋণ খেলাপির মতো বিষয়ে নীতি ব্যবসায়ীরাই ঠিক করে দিচ্ছেন। এখন ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি ও ব্যবসা একাকার হয়ে গেছে, ব্যবসায়ীরা রাজনীতিতে আসছেন, সম্পদ বাড়ানোর জন্য তারা রাজনীতিতে বিনিয়োগ করছেন মুনাফার লক্ষ্যে।

এছাড়াও শুধু তৈরি পোশাক খাতের অন্তত ১৫ জন ব্যবসায়ী এবারের নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন। সালমান এফ রহমান, টিপু মুনিশ ছাড়াও হামীম ফ্রপের কর্ণধার (ফরিদপুর-৩), রেনেসাঁস ফ্রপের প্রতিষ্ঠাতা (রাজশাহী-৬), পোশাক খাতের বিকেএমইএর সভাপতি (নারায়ণগঞ্জ-৫), বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি (খুলনা-৪),

ওয়েল ফ্রপের চেয়ারম্যান (চট্টগ্রাম-৮), শাশা ডেনিমের চেয়ারম্যান (চট্টগ্রাম-৫), মণ্ডল ফ্রপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সিরাজগঞ্জ-৬), নিপা ফ্রপের চেয়ারম্যান (ঢাকা-১৮), তুসুকা ফ্রপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫), ফেবিয়ান ফ্রপের প্রতিষ্ঠাতা (কুমিল্লা-৯), স্প্যারো ফ্রপের চেয়ারম্যান (সিরাজগঞ্জ-৬), স্মার্ট ফ্রপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চট্টগ্রাম-১৬)। এ ছাড়া নির্বাচনে গাজী ফ্রপের চেয়ারম্যান (নারায়ণগঞ্জ-১), সাউথ বাংলা অ্যাগ্রিকালচার ব্যাংকের চেয়ারম্যান (কুমিল্লা-৬), আফিল ফ্রপের প্রতিষ্ঠাতা (যশোর-১), জেমকন ফ্রপের ভাইস চেয়ারম্যান (যশোর-৩) প্রমুখ নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। সব মিলিয়ে সংসদে ২৫৪ জন সদস্য আছেন যাদের অস্থাবর সম্পত্তি ১ কোটি টাকার বেশি আর স্থাবর সম্পত্তি হিসাব করলে কত হবে তা অনুমান করাও কঠিন।

রাষ্ট্রের প্রশাসন যন্ত্র ব্যবহার করে, নির্বাচন কমিশন জনগণের ট্যাক্সের টাকা দিয়ে বিজ্ঞাপন চিত্র বানিয়ে প্রচারণা চালিয়ে এবং কোটিপতি প্রার্থীরা টাকা ছড়িয়ে আশ্রয় চেষ্টা করেছেন ভোট কেন্দ্রগুলোতে ভোটের টানার জন্য। কিন্তু এত কিছু পরও কিন্তু ভোটের অংশগ্রহণ নিয়ে বিতর্ক থেকেই গেল। ভোটের উপস্থিতি বিকেল সাড়ে তিনটায় কমিশন সচিব ঘোষণা করলেন বিকেল ৩টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ২৬.৩৬ শতাংশ আর প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় বলেন, সর্বশেষ ভোট পড়েছে ২৮ শতাংশ কিন্তু কমিশনারের পাশের ব্যক্তি প্রকাশ্যে কানের কাছে বললেন ৪০ শতাংশ, তখন সিইসি বলেন ৪০% এটা নির্ভরযোগ্য, এবং সব শেষ হিসেবে দেখালো ৪১.৮ শতাংশ। এটা কেমন করে হলো সেই বিতর্ক থাকলেও সাধারণভাবে অনেকেই ধারণা করে বলছেন ভোটের উপস্থিতি ২০ শতাংশের বেশি হয়নি। ভারতের জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক শ্রীরাধা দত্ত প্রথম আলোকে সাক্ষাৎকার দিয়ে বলেছেন, ‘আওয়ামী লীগপন্থি আমাদের পরিচিত অনেকে বলেছেন, ভোট পড়েছে ২০ শতাংশের নিচে।... আমার চেনাজানাদের মধ্যে খুব কম মানুষই ভোট দিয়েছেন, ১০ শতাংশের বেশি তো ভোটই দেয়নি।’ আর অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন কীভাবে বলা হবে? যেখানে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরাই অংশ নেয়নি, সেখানে অংশগ্রহণমূলক কীভাবে হবে। আর তাতে নির্বাচন স্বচ্ছ (!) হলেও গ্রহণযোগ্য হওয়ার পথ কি খোলা আছে? ফলে এই নির্বাচন যে গ্রহণযোগ্য নয় সেই বিতর্ক শুরু হয়েছে তা চলতে থাকবে। এই বিতর্কে আগুন দিয়েছেন সরকার সহযোগী জাতীয় পার্টির নেতারা। তারা বলেছেন, সরকার যাকে বিজয়ী করতে চেয়েছে তাকেই বিজয়ী করেছে। জোট সহযোগী জাসদ নেতারাও বলেছেন প্রশাসনের নগ্ন ভূমিকার কথা এমনকি আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থীরা সংবাদ সম্মেলন করে নির্বাচনে প্রশাসনিক কারচুপি, পক্ষপাতিত্ব, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কথা বলেছেন, তাদের ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন। এমনকি সরকার দলীয় নৌকা প্রতীকের প্রার্থী বেশ কয়েকজন হেরে যাওয়া সিটিং এমপিও কারচুপি-অনিয়মের অভিযোগ করেছেন। তারপরও তড়িঘড়ি করে শপথ নয়ানো হলো, মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হওয়া সবই হলো। নৈতিক এই নির্বাচনের কথা যদি আলোচনা নাও করা হয় তারপরও প্রশ্ন তুলতে হবে, সংসদে ব্যবসায়ী বেড়ে যাওয়া, কোটিপতি বেড়ে যাওয়া এবং রাজনীতিবিদ কমে যাওয়ায় সংসদ কার স্বার্থ রক্ষা করবে? আওয়ামী লীগ বলছে, গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা সুরক্ষিত হয়েছে, এই নির্বাচন আইনগতভাবে বৈধ হয়েছে এবং সংবিধানের ধারাবাহিকতা রক্ষা পেয়েছে। সংবিধানের মূল চেতনাকে ধূলিসাৎ করে দিতে সংবিধান রক্ষার যুক্তি জনগণের কাছে কোনভাবেই গ্রহণযোগ্যতা পাবে না।

এই নির্বাচন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধঃপতনের চিত্রই শুধু তুলে ধরেছে তা নয়, ক্ষমতাসীন দলের নেতা কর্মীদের, নির্বাচন কাজে সহায়তাকারী প্রশাসনিক কর্মচারী, নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারী শিক্ষক সম্প্রদায়, পুলিশ-বিজিবি, সেনা সদস্যদের নৈতিক মানকে নিচে নামিয়ে দিয়েছে। যারা নিজ চোখে দেখেছেন, সহায়তা করতে বাধ্য হয়েছেন বা স্বেচ্ছায় করেছেন তারা কি গ্লানিবোধে ভুগবেন না কখনো? ফলে পুঁজিবাদ শুধু শোষণ করে না, মানুষের গণতান্ত্রিক বোধ, নৈতিক বোধ, দায়িত্ববোধ সব কিছুকেই ধ্বংস করতে থাকে। এই চিত্র যেমন বিশ্বব্যাপী তেমনি বাংলাদেশেও। ফলে সৃষ্ট ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন, কালো টাকা ও কোটিপতিদের নির্বাচন, কালোআইন প্রবর্তন করার নির্বাচনী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই গড়ে তোলা ছাড়া বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কোনটাই রক্ষা করা যাবে না। ২০২৪ সালের নির্বাচন শুধু সমাজের গভীর সংকট দেখিয়ে দিয়েছে তাই নয়, এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামার প্রয়োজনীয়তাটাকেও তুলে ধরেছে।

ভোট বর্জনের গণরায় মেনে ‘ডামি’ নির্বাচন বাতিল কর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাম জোটের সমন্বয়ক ও বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল কবির জাহিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে জোটের নেতৃবৃন্দ সরকারের দমন-সীড়ন, ভয়-প্রলোভন উপেক্ষা করে ৭ জানুয়ারির নির্বাচন বর্জন করায় দেশবাসীকে অভিনন্দন ও নির্বাচন বাতিল করে পুনঃনির্বাচন অনুষ্ঠিত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের বেশিরভাগ কেন্দ্র ছিলো ফাঁকা, কেন্দ্রের সামনে ও ভেতরে আওয়ামী লীগের কর্মীরা ছাড়া ভোটের উপস্থিতি ছিল খুবই নগণ্য। ‘নির্বাচন কমিশনের তথ্যানুসারে, দুপুর ১২টা ১০ মিনিট পর্যন্ত সারাদেশে ভোট পড়েছিল মাত্র সাড়ে ১৮ শতাংশ এবং বিকাল ৩টার সময় ছিলো ২৬.৬৭ শতাংশ।’ নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ। শিশুদের দিয়ে ভোট দেয়ানো, পূর্বেই সিল দেয়া ব্যালট দিয়ে বাস্তব ভর্তি করা, সরকারের মন্ত্রীর প্রকাশ্যে ব্যালট পেপারে সিল মারা, জাল ভোট প্রদান, ‘রেজাল্ট শিটে আগেই এজেন্টদের স্বাক্ষর নিয়ে নেন প্রিজাইডিং কর্মকতা’ ‘হঠাৎ দীর্ঘ সারি, একটু পরই ফাঁকা’ দেশের প্রতিটি কেন্দ্রে এই ঘটনা ঘটেছে, ‘ডামি বিরোধী’ প্রার্থীদের পোলিং এজেন্টকে বের করে দেয়া, ভোটকেন্দ্র দখলে বিজিবি ও সরকারি গোয়েন্দা সংস্থাকে ব্যবহার, সরকারি দলকে ভোট না দিলে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতাভুক্ত ভাতা বন্ধের হুমকি, সন্ত্রাসীদের দিয়ে হুমকি-ধামকিসহ নির্বাচনে সরকারি দলের প্রার্থীদের জেতার জন্য সবই করা হয়েছে এই নির্বাচনে।

জোটের নেতৃবৃন্দ একতরফা ‘প্রহসনের নির্বাচন’ বর্জন করায় জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং অবিলম্বে গণদাবি উপেক্ষা করে অনুষ্ঠিত তামাশার নির্বাচন বাতিল করে পুনঃনির্বাচন এবং জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধভাবে ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বেগবান করার আহ্বান জানান।

সভায় বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)’র সভাপতি কমরেড মোহা. শাহ আলম, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশারফা মিশু, বাসদ (মার্কসবাদী)’র জয়দ্বীপ ভট্টাচার্য, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী ও কমিউনিস্ট লীগের শামীম ইমাম প্রমুখ।

একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত

ছাত্র ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৫ নভেম্বর আলী আহম্মদ চুনকা পাঠাগার ও মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার আহ্বায়ক সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে নবীনবরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাসদ নারায়ণগঞ্জ জেলার সদস্যসচিব আবু নাসিম খান বিপ্লব, নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোটের উপদেষ্টা ভবানী শংকর রায়, ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন, জেলার সাধারণ সম্পাদক নাছিম সরদার প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, শিক্ষা-সংস্কৃতি, মনুষ্যত্ব রক্ষার সংগ্রামে ছাত্র ফ্রন্ট অব্যাহত সংগ্রাম করে আসছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে সর্বজনীন বিজ্ঞানভিত্তিক সেকুলার একই পদ্ধতির বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক শিক্ষার দাবিতে ছাত্র ফ্রন্ট আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। রাষ্ট্র নাগরিকদের একই পদ্ধতির সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকলের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু স্বাধীনতার ৫২ বছর পরও এই অধিকার নিশ্চিত করা যায়নি। শিক্ষার যতটুকু অধিকার ছিল তাও প্রতিনিয়ত সংকুচিত করা হচ্ছে। প্রতি বছর মাধ্যমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে



১০ থেকে ১২ লাখ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়ে থাকে কিন্তু শিক্ষার্থীদের দেহ-মনে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যে আয়োজন থাকার কথা তা সরকার নিশ্চিত করতে পারেনি। শিক্ষার মান ক্রমাগত নিচে নামছে এবং শিক্ষাকে বানানো হচ্ছে বাণিজ্যিক পণ্যে। দেশের ৫৫ শতাংশ শিশু প্রাক-প্রাথমিক স্তরে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোর সুপারিশ অনুসারে, একটি দেশের শিক্ষাখাতে বরাদ্দ হওয়া উচিত মোট বাজেটের ২০ শতাংশ অথবা জিডিপি

৬ শতাংশ। কিন্তু বাংলাদেশে এই বরাদ্দ দুই শতাংশের কাছাকাছি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার শিক্ষার দায়িত্ব থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে। দেশে প্রাথমিক স্তরে মোট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হার ২২ শতাংশ; মাধ্যমিক পর্যায়ে এই হার ৯৪ শতাংশ, যা বিশ্বে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। দেশে নিম্ন মাধ্যমিকে কোনো সরকারি বিদ্যালয় নেই কিন্তু বেসরকারির সংখ্যা দুই হাজার ৩৬৯টি; মাধ্যমিক সরকারি বিদ্যালয় মাত্র ৬২৭টি আর বেসরকারির সংখ্যা ১৮ হাজার ২৮০টি; সরকারি স্কুল এন্ড কলেজ ৬৪টি আর

বেসরকারি এক হাজার ৩৮২টি; সরকারি কলেজ ৬৩৭টি আর বেসরকারি ২ হাজার ৬৬৪টি। (তথ্যসূত্র : মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩)। এখন অভিভাবককে শিক্ষা ব্যয়ের ৭১ শতাংশ বহন করতে হয়। তাই যার যত বেশি টাকা আছে সে তত দামি প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে, আর যার টাকা নেই সে শিক্ষা থেকে বারে পড়বে। শিক্ষার গণতান্ত্রিক পরিবেশ আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রতিটি জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় করার ঘোষণা থাকলেও নারায়ণগঞ্জ জেলায় একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নেই, নেই কোনো মেডিকেল কলেজ। প্রতি বছর জেলার হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে পড়াশোনার জন্য পাড়ি জমাতে হয় জেলার বাইরে। বই-খাতা, কলমসহ সকল শিক্ষা উপকরণের দাম আকাশচুম্বি। পর্যাপ্ত আয়োজন নিশ্চিত না করে শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন করেছে সরকার। এ ব্যাপারে ছাত্র-শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা গবেষকদের মতামত নেওয়া হয়নি। শিক্ষাক্রম ২০২১ স্থগিত করে সংশ্লিষ্টজনের মতামত নিয়ে পর্যালোচনা ও পরিমার্জন করে বাস্তবায়ন করার দাবি জানান নেতৃবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দ নবীনবরণ অনুষ্ঠানে আরও বলেন, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও দখলদারিত্ব মুক্ত করে শিক্ষার গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। শিক্ষাবাণিজ্য বন্ধ করতে হবে। শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ-বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ করতে হবে।

সাম্পান সুজ লিমিটেডের শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পরিশোধ, বন্ধ কারখানা চালুর দাবি

সাম্পান সুজ কারখানার শ্রমিকদের বিক্ষোভ

কাঁচপুরে বিসিকে অবস্থিত সাম্পান সুজ লিমিটেডের শ্রমিকদের তিন মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ ও বন্ধ কারখানা চালুসহ ১০ দফা দাবিতে কারখানার শ্রমিকরা নারায়ণগঞ্জে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে ৩ ডিসেম্বর বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। শুরুতে জেলার কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে এবং পরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কার্যালয়ের প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ দুটিতে কারখানার শ্রমিক মোবারক হোসেনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি আবু নাসিম খান বিপ্লব, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট জেলার সভাপতি সেলিম মাহমুদ, শ্রমিকনেতা এস এম কাদির,



রুহুল আমিন সোহাগ, আনোয়ার খাঁন, কারখানার শ্রমিক রোজিনা আক্তার, আরিফুর রহমান, মাহমুদা আক্তার, ডলি আক্তার, মো. শামীম।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সাম্পান সুজ লিমিটেডের

শ্রমিকদের ৩ মাসের মজুরি দিচ্ছে না কারখানার মালিক। প্রতি মাসে বেতন প্রদানে গড়িমসি করে ৩ মাস কাটিয়ে ২৯ নভেম্বর '২৩ কারখানাটি বেআইনিভাবে বন্ধ করে দিয়েছে। ২৮ নভেম্বর

কারখানার শিপমেন্ট হয়েছে। ২৯ নভেম্বর সকালে শ্রমিকরা কাজ করতে গিয়ে দেখে কারখানা বন্ধ। বন্ধের আগে কোন নোটিশও দেওয়া হয়নি। এর মধ্যদিয়ে মালিক শ্রম আইনকে উপেক্ষা করেছে। আইন অনুযায়ী কারখানা বন্ধের আগে শ্রমিকদের সকল পাওনা বুঝিয়ে দিতে হবে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, ২ শতাধিক শ্রমিক ৩ মাসের বেতন না পেয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে অনাহারে অর্ধাহারে নানা সংকটে জীবনযাপন করছে। কারখানা বন্ধ হওয়ায় তারা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছে। শ্রমিকরা ইতিমধ্যে তাদের সংকটের কথা ও বকেয়া বেতন পরিশোধ কারখানা চালুর দাবি জেলা প্রশাসন, শ্রম দপ্তর, কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরকে জানিয়েছে।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে শ্রমিকদের ৩ মাসের বেতন ও কারখানা খুলে দেয়াসহ ১০ দফা মেনে নেয়ার দাবি জানান।

শ্রমিকশ্রেণির মুক্তির সংগ্রামে কমরেড লেনিন আজও পথপ্রদর্শক

শেষ পৃষ্ঠার পর

করতে পারে ইতিপূর্বে যা ছিল কল্পনার বিষয়, লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার বলশেভিক পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণি সেটা বাস্তবে পরিণত করেছে। শোষণ মূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সামাজিক মালিকানাভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে লেনিন পরিচালনা করেন এক দীর্ঘ সংগ্রাম। এর জন্য তিনি যেমন বিভিন্ন মতাদর্শিক বিদ্রোহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন আবার বিপ্লবের পরিপূরক রাজনৈতিক দল গড়ে তোলেন। শ্রমিকশ্রেণির সংগঠিত বাহিনী হিসাবে পার্টি গড়ে তুলেছেন এবং এই ধারণা গড়ে তুলছে পেরেছিলেন যে, পার্টি শুধু শ্রমিকশ্রেণির অগ্রগামী বাহিনীই নয়। পার্টি যদি সত্যিই শ্রেণি সংগ্রাম পরিচালনা করতে চায় তবে তাকে নিজ

শ্রেণির সংগঠিত বাহিনীও হতে হবে। পার্টির বাইরের লাখ লাখ বিক্ষিপ্ত শ্রমিককে লড়াইয়ের সময় শ্রঙ্খলাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, তাদের মধ্যে সংগঠন আর সহযুক্তি জাগিয়ে তুলতে হবে। শ্রমিক আন্দোলনের অর্থনীতিবাদী ধারণা যে বিদ্রোহ তৈরি করে, তার বদলে রাজনৈতিক প্রশ্নকে সামনে এনে রাশিয়াতে জার ও কেরেনস্কি সরকারকে উচ্ছেদ করে দুনিয়ার ইতিহাসে প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফলভাবে সম্পন্ন করেন। লেনিনের সুযোগ্য উত্তরসূরি মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন সারা দুনিয়ার মুক্তিকামী মানুষের মুক্তির সংগ্রামের দিশারীতে পরিণত হয়েছিল। ইউরোপের অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশ বলে পরিচিত রাশিয়া মানুষের জীবনের এক অনন্য অগ্রগতি সাধন করেছিল যা গোটা

দুনিয়ার মানুষকে অবাক করেছিল, রুখে দিয়েছিল হিটলারের নাৎসি আগ্রাসন। পুঁজির একচেটিয়া রূপ ও সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিকে বিশ্লেষণ করে লেনিন দেখান, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ টিকে থাকা মানেই যুদ্ধ টিকে থাকা। তাই পৃথিবীকে যুদ্ধ ও হানাহানি মুক্ত করতে হলে পুঁজিবাদকে বিদায় করা ছাড়া ভিন্ন কোন পথ নেই।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, আজকের দিনে পুঁজিবাদী শাসন ফ্যাসিবাদী বৈশিষ্ট্য নিয়েই দেশে দেশে টিকে থাকবে। আমাদের দেশেও ফ্যাসিবাদী শাসন চলছে। পুঁজিবাদী দুঃশাসনে মানুষ দিশেহারা। মানুষের বিগত সংগ্রামের অর্জনগুলো এরা ধুলায় মিশিয়ে দিচ্ছে। এর বিপরীতে সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম, পুঁজিবাদকে হটানোর সংগ্রামকে জোরদার করাই লেনিনের

শিক্ষা। আবার বিশ্বব্যাপী যে যুদ্ধ চলছে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো নিজেদের কর্তৃত্ব রক্ষা করতে যেভাবে একে অপরের বিরুদ্ধে হামলে পড়ছে, গোটা দুনিয়ার মানবতাকে বিপন্ন করছে তা থেকে পরিত্রাণ পেতে আমাদের যেতে হবে লেনিনের কাছে। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, মুক্ত্যর একশত বছর পরেও লেনিন বিশ্ব মানবতার মুক্তি তথা শ্রমিকশ্রেণির মুক্তির সংগ্রামে এখনও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

স্মরণসভার সভাপতি ২০২৪ সাল বছরব্যাপী লেনিন রচনা পাঠ, সেমিনার আয়োজনসহ নানা কর্মসূচির মাধ্যমে লেনিন মৃত্যু শতবর্ষ পালনের ঘোষণা দেন।

সভার শুরুতে বাসদ নেতৃবৃন্দ কমরেড লেনিনের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

গ্রেডের ফাঁদে শ্রমিকদের মজুরি কমানোর অপকৌশল বন্ধ কর



পোশাক শ্রমিকদের মজুরি বাজারদরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে পুনর্নির্ধারণ, গ্রেডের ফাঁদে শ্রমিকদের মজুরি কমানোর অপকৌশল বন্ধ, জ্যাকার্ড অপারেটর ও প্রোডাকশন শ্রমিকদের মজুরি কাঠামোর ১ নং গ্রেডে পদায়ন, জ্যাকার্ড অপারেটর, নিটিং অপারেটরসহ সকল ক্ষেত্রে ৮ ঘণ্টা কর্মদিবস বাস্তবায়ন, মজুরি আন্দোলনে শ্রমিক হত্যার বিচার, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে ক্ষতিপূরণ প্রদান, শ্রমিকদের নামে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং গ্রেপ্তারকৃত শ্রমিক ও শ্রমিক নেতাদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে ৫ জানুয়ারি '২৪ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করে গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট। গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি আহসান হাবিব বুলবুলের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক সেলিম মাহমুদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সহসভাপতি খালেদুজ্জামান লিপন, শ্রমিকনেতা অ্যাড. সৌমিত্র কুমার দাস, রাহাত আহমেদ, আল আমিন হাওলাদার শ্রাবণ, মোহাম্মদ সোহেল, আনিসুর রহমান আনিস, আনোয়ার খান প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, গার্মেন্টস শ্রমিকরা ২৩ হাজার টাকা মজুরির দাবি জানিয়েছিল কিন্তু গার্মেন্টস মালিকরা শ্রমিকদের দাবি পূরণ করেনি। উপরন্তু মজুরির আন্দোলনে গুলি করে শ্রমিক হত্যা, মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার, হয়রানি, শক্তি প্রয়োগ, ছাঁটায়ের হুমকি প্রদানসহ নানা অপকৌশলে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরির শান্তিপূর্ণ আন্দোলন দমন করার পথ বেছে নেয়।

নিম্নতম মজুরি বোর্ড গার্মেন্টস মালিকদের মজুরি প্রস্তাবকেই চূড়ান্ত মজুরি হিসাবে ঘোষণা করে। প্রধানমন্ত্রীও সে মজুরি মেনে নেয়ার জন্য শ্রমিকদের নির্দেশ দেয়। শিল্প পুলিশও মালিকদের পক্ষে কাজ করেছে। মজুরি বোর্ডসহ রাষ্ট্রযন্ত্রের

ভূমিকা ছিল মালিকদের ইচ্ছাপূরণের হাতিয়ার। রাষ্ট্র এবং সরকার, দেশের কারাখানা মালিক আর বিদেশি ক্রেতাদের সস্তা শ্রম লুটের সিডিকেটের পক্ষ নেয়ায় নেতৃবৃন্দ নিন্দা জানান।

নেতৃবৃন্দ বলেন, নামমাত্র মজুরি নির্ধারণের পর সেই মজুরিও বাস্তবায়ন না করার বিভিন্ন অপকৌশল নিচ্ছে গার্মেন্টস মালিকরা। গ্রেড কাঠামোয় নিজেদের ইচ্ছামত পরিবর্তন করে শ্রমিকদের নতুন গ্রেড কাঠামোয় সঠিকভাবে পদায়ন না করে নিচের গ্রেডে পদায়ন করে শ্রমিকদের প্রকৃত প্রাপ্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। জ্যাকার্ড ও নিটিং মেশিন অপারেটরদের এখনো দৈনিক ১২ ঘণ্টা কাজের ভিত্তিতে মজুরি ধরা হচ্ছে। গার্মেন্টস মালিকরা দেশে-বিদেশে মিথ্যা তথ্য ছড়াচ্ছে। ফলে শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষেভ ও উত্তেজনা তৈরি হচ্ছে। নেতৃবৃন্দ, আশংকা প্রকাশ করেন যে গার্মেন্টস মালিকরা পূর্বের মতোই পুরোনো শ্রমিকদের চাপ দিয়ে কম বেতনে কাজ করতে বাধ্য করা অথবা চাকরিচ্যুত করে কম মজুরিতে নতুনভাবে শ্রমিক নিয়োগ করে উৎপাদন ব্যয় কমানোর অপকৌশল প্রয়োগ করার চেষ্টা করছে যা নিন্দনীয়। মালিকদের এই অগ্রহণযোগ্য প্রচেষ্টার কারণে উদ্ভূত যেকোনো পরিস্থিতির দায় মালিকদের বহন করতে হবে। নেতৃবৃন্দ, মজুরি আন্দোলনে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তির দাবি জানিয়ে বলেন, ভয় দেখিয়ে, মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি, এস.ডি.জি'র গাল-গল্প শুনিয়ে, অর্ধভুক্ত শ্রমিকদের ক্ষেভ বেশিদিন দমন করতে পারবেন না। তদন্তের মাধ্যমে মজুরি আন্দোলনে নিহত শ্রমিকদের হত্যার জন্য দায়ীদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনা এবং ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক পরিবার কে আজীবন আয়ের মানদণ্ডে ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবি জানান।

কমরেড মাহফুজুল ইসলামের মৃত্যুতে শোক



বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ৫ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বাসদ

মিরপুর থানা শাখার সদস্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা কমরেড মাহফুজুল ইসলামের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন, শুভাকাঙ্ক্ষীসহ শোকাহত সকলের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, স্ট্রোক করার পর ঢাকার জাতীয় নিউরো সায়েন্স হাসপাতালে গতকাল ৪ ডিসেম্বর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি ঢাকার সরকারি সায়েন্স ল্যাবরেটরির কর্মকর্তা ছিলেন।

বিবৃতিতে কমরেড ফিরোজ বলেন তাঁর মৃত্যুতে বাসদ দলের একজন সক্রিয় সমর্থক ও দরদিকে হারালো। উল্লেখ্য, বাসদ চট্টগ্রাম জেলা ও মীরসরাই উপজেলার নেতৃবৃন্দ কমরেড মাহফুজুলের মরদেহে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

আদিবাসীদের প্রিয় নেতা রবীন্দ্রনাথ সরেনের মৃত্যুতে শোক



জাতীয় আদিবাসী পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সমতলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অকৃত্রিম বন্ধু রবীন্দ্রনাথ সরেন ১২ জানুয়ারি রাতে দীর্ঘ রোগ ভোগের পর দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুরে বরকোনা গ্রামে নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ১৩ জানুয়ারি '২৪ সংবাদপত্রে দেয়া এক বিবৃতিতে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবার ও তাঁর

সহকর্মী জাতীয় আদিবাসী পরিষদের নেতৃবৃন্দের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও কেন্দ্রীয় বর্ধিত ফোরামের সদস্যদের ২ দিনব্যাপী সভা চলাকালে কমরেড রবীন্দ্রনাথ সরেনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর ১৩ জানুয়ারি ভ্যানগার্ড কার্যালয় হল রুমে দ্বিতীয় দিনের সভার শুরুতে প্রয়াত রবীন্দ্রনাথ সরেনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

শোক বিবৃতিতে কমরেড ফিরোজ বলেন, আদিবাসী নেতা রবীন্দ্রনাথ সরেনের মৃত্যুতে সমতল আদিবাসীদের ভূমির অধিকারসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এক অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হলো; বাসদ হারালো এক অকৃত্রিম বন্ধুকে।

বিবৃতিতে তিনি এই ক্ষতিপূরণে শোককে শক্তিতে পরিণত করে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে জাতীয় আদিবাসী পরিষদের পতাকাতে ঐক্যবদ্ধ থেকে আদিবাসীদের ভূমির অধিকারসহ সকল নির্ধাতন নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জারি রাখা এবং আদিবাসী-বাঙালির শোষণমুক্তির সংগ্রামকে এগিয়ে নেয়ার আহ্বান জানান।

প্রতিবছর বিশ্বে ৩০ লাখ শ্রমিক কর্মস্থলে দুর্ঘটনা ও পেশাগত ব্যাধিতে মৃত্যুবরণ করে-আইএলও

প্রতিবছর ৩০ লাখ শ্রমিক কর্মস্থলে দুর্ঘটনা ও নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও-র এক প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা যায়। প্রতিবেদনে দেখানো হয় শুধুমাত্র এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলেই ৬৩ শতাংশ মৃত্যুবরণ করে। দীর্ঘ শ্রমঘণ্টা (সপ্তাহে ৫৫ ঘণ্টারও বেশি) হলো সবচেয়ে বড় ঘাতক। ২০১৬ সালে এর

ফলেই ৭.৪৫ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়। এরপরই কর্মস্থলের দূষিত পরিবেশ (গ্যাস, ধোয়া, শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে নানা বিষাক্ত ধূলিকণার প্রবেশ, ইত্যাদি) এর দরুন ৪.৫ লাখ মানুষের মৃত্যু এবং তারপরই রয়েছে পেশাগত রোগে মৃত্যু ৩.৬৩ লাখ। এই ধরনের দুর্ঘটনা ও মৃত্যু কমাতে আইএলও সমস্ত স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর কাছে আবেদন করেছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা কমরেড নূর মোহাম্মদের মৃত্যুতে শোক



বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ১৬ ডিসেম্বর '২৩ সংবাদপত্রে দেয়া এক বিবৃতিতে বাসদ শেরপুর জেলা শাখার সদস্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও গণসঙ্গীত শিল্পী নূর মোহাম্মদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার ও সহকর্মীদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরেই কমরেড নূর মোহাম্মদ হৃদরোগসহ বিভিন্ন জটিলতায় ভোগছিলেন। এ অবস্থায় তিনি ১৫ ডিসেম্বর আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

কমরেড মামুন হকের মৃত্যুতে শোক



বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ২৪ ডিসেম্বর ২০২৩ সংবাদপত্রে দেয়া এক বিবৃতিতে সাবেক ছাত্র ফ্রন্ট নেতা ফায়াজুল হক মামুন ওরফে মামুন হকের অকাল

মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তার শোকসন্তপ্ত পরিবার ও স্বজনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট গাজীপুর জেলা শাখা সাবেক আহ্বায়ক ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ফ্রন্ট নেতা মামুন হক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ১১টায় মৃত্যুবরণ করেন।

বিবৃতিতে কমরেড ফিরোজ বলেন, তাঁর মৃত্যুতে বাসদ একজন সমর্থক হারালো। উল্লেখ্য, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটি সভাপতি মুক্ত বাইরে ও সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন এক বিবৃতিতে ফায়াজুল হক মামুনের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন।

পুঁজিবাদী শোষণ-ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন হটাও, বাম গণতান্ত্রিক বিকল্প গড়

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রহসনের নির্বাচনী কার্যক্রম সম্পন্ন করে এগিয়ে চলছিল তখন আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় এই কার্যক্রম থেকে সরকারকে বিরত থাকার দাবি যেমন আমরা করেছি, তেমনি বাম গণতান্ত্রিক জোটসহ অন্যান্য প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল সংগঠন, ব্যক্তিবর্গ এই নির্বাচন বর্জন করতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল। ভোট কেন্দ্রে এবং ভোটের ঘোষিত ফলাফলে দেখা যায় আমাদের আহ্বানে জনগণের নীরব ও সরব সমর্থন দিয়েছ ভোট পড়ার হারই যার প্রমাণ।

নির্বাচনে অধিকাংশ দল ও ব্যক্তি অংশগ্রহণ করছে এটি দেখাতে সরকার ন্যূনতম নীতি নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে দলীয় প্রার্থীর বাইরে নিজ দলের লোককে দিয়েই কোথাও ডামি, কোথাও স্বতন্ত্র প্রার্থী করা, নতুন নতুন কিংস পার্টি তৈরি করে তাদের প্রার্থী করা, আর আগে থেকে সরকারের তাবেদারি করে বা নানাভাবে প্রলোভন দেখিয়ে যাদেরকে একত্রিত করা যায় সেই সব দলের নামে প্রার্থীদের জড়ো করার চেষ্টা করে। নিজেদের মধ্যে সমঝোতার ও ভাগাভাগির এই নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখানোর এবং ভোটে জনগণের ও অনেক দলের অংশগ্রহণ দেখানোর চেষ্টা করা হয়।

অতীতে প্রহসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার জন্য জনগণকে ভয়ভীতি দেখিয়ে বলা হতো—ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার দরকার নাই। ভোট কেন্দ্রে না গেলেও ভোট হয়ে যেত, এটা সবার জানা। এবারের চিত্র ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। সরকারের পক্ষ থেকে এবং বিভিন্ন প্রার্থীর পক্ষ থেকে ভোটারদের অনুরোধ করে ভোট দিতে নয়, ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছিল। এটি ছিল প্রকাশ্য বক্তব্য। এর বাইরে নানা হুমকি-ধামকি, ভয়ভীতি প্রদর্শন, লোভ দেখানোর মধ্য দিয়েই ভোটকেন্দ্রে জনগণকে উপস্থিত করার চেষ্টা করা হয়। বিভিন্ন এলাকার তথ্য বলছে এজন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেঁধে রাখার কার্ডধারী দেশের এক কোটি ২৯ লক্ষ মানুষ আর তাদের পরিবারকে প্রধান টার্গেট করা হয়। বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়, ভোটকেন্দ্রে না গেলে এসব সুযোগ-সুবিধা বাতিল হবে। অনেক জায়গায় কার্ড জমা নেওয়া এমনকি জাতীয় পরিচয়পত্র জমা নেওয়ার খবরও পাওয়া গেছে। এসব জায়গায় ভয় দেওয়ার সাথে নানা ধরনের প্রলোভনও দেখানো হয়। নানা বাধা নিষেধ সত্ত্বেও ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যমে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা গেছে বিভিন্ন জায়গায় ভোটার না হলেও কিশোর যুবকদের নগদ টাকা দিয়ে জড়ো করা হয় দিনভর ভোটকেন্দ্রে থাকার জন্য। সাংবাদিক ও কথিত নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল কেন্দ্রে গেলে প্রয়োজনমতো লাইনে দাঁড়ানোসহ নানামুখী কাজে তাদেরকে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া প্রার্থীরাও আত্মীয়তা, স্থানীয় পরিচিতিসহ নানা পদ্ধতি ব্যবহার করে ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে আনার প্রচেষ্টা নিয়েছে। এরপরেও ভোটারদের টানতে পারেনি।

নির্বাচনের পূর্বে দেশব্যাপী বাম জোটের পক্ষ থেকে দেশের মানুষকে ভোট বর্জনের আহ্বান জানিয়ে অনুষ্ঠিত সভাসমূহে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলে নেতৃবৃন্দ বুঝেছেন, এই নির্বাচনে জনগণের আগ্রহ নেই, মানুষের কথা শুনে মনে হয়েছে ‘এই ভোটে সাধারণ মানুষের সায় নেই’। মানুষ তার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতাসীনদের ভূমিকা দেখে বুঝতে পারে এটা লোক দেখানো নির্বাচন। যার ফলাফল আগেই নির্ধারিত।

ভোট শেষে এই চিত্রই দেখা গেল। আন্দোলনকারীদের বক্তব্যের বাইরেও নৌকা মার্কার পরাজিত প্রার্থী, আওয়ামী লীগ দলের সদস্য হিসেবে, নেতা হিসেবে সুপরিচিত অখচ স্বতন্ত্র হেরে যাওয়া প্রার্থী, জাতীয় পার্টি, ১৪ দলের

শরিক প্রার্থী, কিংস পার্টির প্রার্থীসহ হেরে যাওয়া প্রার্থীদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ভোটের আসল চিত্র বেরিয়ে আসছে।

এসব প্রার্থীদের কথায়

প্রধানত যা ফুটে উঠেছে তা হল :

সরকারের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরে নির্ভর করেছে হারা জেতা। এর জন্য ছাপ্পা ভোট, প্রশাসনিক কারসাজিসহ নানামুখী কারসাজি করা হয়েছে।

বিভিন্ন জায়গায় সরকারি দলের প্রার্থী ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের নিজস্ব ভোট কেন্দ্রে কিছু মানুষ ভোট দিতে গেছে। এছাড়া অন্যান্য কেন্দ্রে দুই-তিন, পাঁচ-দশ জন মানুষ ভোট দিতে গেছে। ভোট কেন্দ্রে মানুষ ছিল না। সময় সময়ে যেসব জটলা দেখা গেছে তা ছিল ভোটার না এমন জমা করে রাখা লোকদের লোক দেখানো সমাবেশ। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সরকার শুধু বিরোধী রাজনৈতিক দল নয়, সরকারি দল আওয়ামী লীগ তাদের সমর্থক বা সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোকেও নিশ্চিহ্ন করার কাজটি সম্পন্ন করেছে। যা অতীতের একদলীয় শাসনের দিকে যাত্রারই ইঙ্গিত বহন করে।

আওয়ামী লীগ সরকারের অগণতান্ত্রিক অনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বাম গণতান্ত্রিক জোট তার সাধ্য মতো আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে এর বাইরে শাসক শ্রেণির ক্ষমতা প্রত্যাশী অংশ আন্দোলনে জনগণের উপর নির্ভর না করে, বিদেশ নির্ভর হয়ে পড়ে। ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতা প্রত্যাশী উভয় দলই বিদেশিদের সমর্থন পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। এই বিদেশ নির্ভরতা দেশের রাজনীতিকে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদী শক্তিকে দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ করে দেয়। যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।

এরই সুযোগ নিয়েছে বিদেশিরা। নিজেদের গোপন এজেন্ডা বাস্তবায়নে নির্বাচন ইস্যুতে অনেকদিন ধরেই তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিল যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশ। অন্যদিকে আঞ্চলিক সাম্রাজ্যবাদী-আধিপত্যবাদী দেশ ভারত, তার সাথে চীন ও রাশিয়ার আনুকূল্য ও সমর্থনে নির্বাচন করেও সরকার শান্তি ও স্বস্তিতে নেই। নির্বাচন প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্য আলাদা ভিসা নীতিও ঘোষণা করে। তামাশার নির্বাচনে গঠিত এই সরকার সম্পর্কে মার্কিনী ও তাদের পশ্চিমা মিত্রদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়ার দিকে বিভিন্ন মহলের নজর রয়েছে। ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে এবং লুটপাট বহাল রাখতে মার্কিনীদের খুশি করতে সরকার আইপিএস, সাগরের গ্যাস ক্ষেত্রসহ দেশের কোন কোন স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়—সেটাই দেখার জন্য দেশবাসীকে অপেক্ষা করতে হবে।

সরকার একদলীয় ব্যবস্থা কায়ম করে দেশে কর্তৃত্ববাদী, ফ্যাসিবাদী শাসন ব্যবস্থা আরও পাকাপোক্ত করতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে।

সরকারের আচরণ, পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহার করা আর নির্বাচনী পরিস্থিতিতে দেখা যায়, দেশের গণতন্ত্রহীনতায় নির্বাচন ব্যবস্থা আজ ভঙ্গুর, সুষ্ঠু নির্বাচন নির্বাসনে চলে গেছে। বর্তমান ও অতীতের ক্ষমতাসীনদের শুধুমাত্র ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি, রাজনীতিকে ব্যবসায় পরিণত করা, মুক্ত বাজারের লুটপাটের অর্থনীতির ধারায় চলমান বাজারি রাজনীতি এই সংকটকে আরও গভীর করে তুলেছে। এরা রাজনীতিকেও রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে নির্বাসনে পাঠিয়েছে। দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতির ফলে লুণ্ঠনকারীরা আজ এসব দলের চালকের আসনে বসে আছে। রাজনীতির এই বৃত্ত ভাঙা না হলে অপরাধনীতি দূর করার পথ পরিষ্কার হবে না। এ অবস্থার পরিবর্তন ছাড়া জনগণের ন্যূনতম ভোটাধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করা যাবে না। বাম গণতান্ত্রিক জোট দীর্ঘদিন ধরে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি চালুসহ নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের জন্য আন্দোলন জারি

রেখেছে। একই সাথে আমরা বলে আসছি যে, চলমান ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের অবসান ঘটিয়ে শোষণমূলক ব্যবস্থার বদল করেই মানুষের সংকট দূর করতে হবে। এছাড়া সাধারণ মানুষের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ, সুশাসন নিশ্চিত করা যাবে না। এজন্য নীতি-আদর্শহীন শোসকশ্রেণির রাজনীতির বিপরীতে নীতিনিষ্ঠ বাম গণতান্ত্রিক বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি সমাবেশ গড়ে তুলতে হবে।

বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রক্ষায় ফ্যাসিবাদী সরকারকে হটিয়ে শোষণমূলক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন করেই মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনার বাংলাদেশ তথা সাম্যের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই লক্ষ্যে সকল নীতিনিষ্ঠ বাম প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, ব্যক্তি-সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি সমাবেশ গড়ে তুলতে হবে। শোষণমূলক ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখে এবং শাসকগোষ্ঠীর কোন অংশের প্রতি নির্ভর করে অবস্থার পরিবর্তন করা যাবে না।

আজকের এই সংবাদ সম্মেলন থেকে আমরা নিম্নলিখিত দাবিসমূহ উপস্থাপন করছি—

- চলমান রাজনৈতিক সংকট দূর করতে একদলীয়, অগ্রহণযোগ্য-জনসমর্থনহীন প্রহসনের নির্বাচনে ঘোষিত সংসদ ভেঙে দিয়ে, তামাশার নির্বাচনে গঠিত সরকারের পদত্যাগ করে অবিলম্বে নির্বাচনকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন দিতে হবে। সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তনসহ নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করতে হবে।

- দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ, সিডিকেট ভাঙা, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিকল্প বাজার ব্যবস্থা চালু এবং গ্রাম শহরে রেশনিং ব্যবস্থা, ন্যায়মূল্যে দোকান চালু করতে হবে।

- শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য বাঁচার মতো জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, কৃষি ফসলের ন্যায় মূল্যসহ উৎপাদক ক্রেতা সমবায় গড়ে তুলতে হবে।

- প্রহসনের নির্বাচনের প্রার্থীদের হলফনামায় যে সম্পদ দেখানো হয়েছে তার প্রকৃত উৎস খুঁজে বের করা এবং এই সম্পদের বাইরে আরও সম্পদ আছে কিনা তা তদন্ত করে ওই তথ্য জনগণের কাছে প্রকাশ্য ভাবে তুলে ধরতে দূদক, এনবিআরসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। প্রকৃত হিসাব দিতে না পারা সম্পদ বাজেয়াপ্ত করাসহ অনৈতিকভাবে সম্পদ আহরণের সাথে জড়িতদের শাস্তি দাবি করছি।

- লুটপাট দুর্নীতি বন্ধ, খেলাপি ঋণ উদ্ধার, পাচারকৃত টাকা ফেরত আনতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও এর সাথে জড়িতদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

- শাসক বুর্জোয়া দলসমূহের নতজানু নীতির ফলে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদী শক্তির দেশের জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠন ও ভুরাজনীতিতে বাংলাদেশকে তাদের স্বার্থে ব্যবহারের যে সুযোগ খুঁজছে সে বিষয়ে এবং দেশের রাজনৈতিক সংকটে বিরাজনীতিকরণের সব ধরনের অশুভ তৎপরতা সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক থাকতে আহ্বান জানাচ্ছি।

- নির্বাচনের আগে ও পরে দেশব্যাপী সংঘাত সংঘর্ষ, হামলা-মামলা, দমনপীড়ন, ভয়ের পরিবেশ তৈরির তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। সব ধরনের নিপীড়ন বন্ধ, গ্রেপ্তারকৃত সকল রাজবন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি এবং কালোআইন বাতিলেরও দাবি করছি।

উল্লিখিত দাবি আদায়ে বাম গণতান্ত্রিক জোটের পক্ষ থেকে দেশব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

এসব দাবিতে আগামী ২৮ জানুয়ারি থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশব্যাপী সভা-সমাবেশ, মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠানেরও কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। এসময় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, শ্রমিকদের জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণসহ জনজীবনের সংকট দূর, সম্পদ লুটপাটকারীদের শাস্তির দাবিতে দূদক, এনবিআর এর সামনে অবস্থান, বিক্ষোভসহ

নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে বলেও নেতৃবৃন্দ জানান।

এসব দাবি আদায়ে আন্দোলনে শক্তি সমাবেশ ঘটাতে ফ্যাসিবাদ বিরোধী বাম ঐক্য, বাংলাদেশ জাসদ, ঐক্য ন্যাপ, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল, জাতীয় গণফ্রন্টসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও শ্রেণি পেশার সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময় এবং যুগপৎ ধারায় কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

অতীত সংগ্রামের ইতিহাস থেকে আমরা জানি জনগণের প্রকৃত জাগরণ ছাড়া বিদ্যমান অবস্থা থেকে দেশকে মুক্ত করা সম্ভব হবে না।

বিভিন্ন সময়ে দেশে দেশে কর্তৃত্ববাদী স্বৈরতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদী সরকার নানা কায়দায় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছে। কোনো কোনো দেশে দুই-তিন দশকও দীর্ঘ হয়েছে এমন দুঃশাসন। কিন্তু জনগণ জেগে ওঠার পর সেই শাসকরা আর টিকে থাকতে পারেনি। বাংলাদেশেও এই মুহূর্তে লুটেরা শাসকশ্রেণির নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন জনগণের ঘাড়ে চেপে বসেছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সব দিক থেকেই শোষিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। দুর্নীতি, লুটপাট, মূল্যবৃদ্ধির যাতাকলে দুঃসহ হয়ে উঠেছে জীবন। সার্বিক পরিস্থিতিতে মানুষ ভেতরে ভেতরে ফুঁসছে। নীতিনিষ্ঠ রাজনৈতিক সংগ্রামে আশার আলো দেখাতে পারলেই জনগণ জেগে উঠবে। গণজাগরণের সেই সম্ভাবনাকে রাজপথে বাস্তব রূপ দিতে বাম গণতান্ত্রিক জোট তার দায়িত্ব এবং অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাবে।

শাসক বুর্জোয়াশ্রেণির উভয় রাজনৈতিক বলয়ের গণবিরোধী ক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতি থেকে গণতন্ত্র ও রাজনীতিকে পুনরুদ্ধার করার সংগ্রাম বাম গণতান্ত্রিক জোট অব্যাহত রাখবে। বাম গণতান্ত্রিক বিকল্প শক্তি সমাবেশ গড়ে তুলবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব দাবি আদায়ে দেশবাসীকেই এগিয়ে আসতে হবে। শ্রমজীবীসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ ছাত্র-যুব, নারী-সাংস্কৃতিক কর্মীসহ সবাইকে নিজস্ব দাবিতে ও ভোটাধিকার, গণতন্ত্রের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণআন্দোলন গণসংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে।

আমরা তাই আহ্বান জানাই, দেশ ও মানুষ বাঁচাতে, কর্তৃত্ববাদী, ফ্যাসিবাদী এই সরকারকে হটিয়ে বাম গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে জনগণ এগিয়ে আসুন। আমাদের মিলিত সংগ্রাম দুর্নীতি দুঃশাসন ও দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতির কষাঘাত থেকে মানুষকে শান্তি ও স্বস্তি দিবে নিশ্চয়ই।

বাংলাদেশে শ্রমিকের কর্মক্ষেত্রে মৃত্যুমিছিল থামছেই না

বাংলাদেশ অকুপেশনাল সেফটি, হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ফাউন্ডেশন (ওশি) কর্তৃক কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাবিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশে ২০২৩ সালে ১ হাজার ৪৩২ জন শ্রমিক নিহত হয়েছে যা ২০২২ সালের তুলনায় ৪৬৫ জন বেশি। ২০২৩ সালে পরিবহন খাতে ৬৩৭, দিনমজুর ২২০, নির্মাণ খাতে ১৪৯, কৃষিশ্রমিক ১৪৬, পোশাকশিল্পে ৬৪, ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ৯৪, মৎস্য খাতে ৫৩, সেবাখাতে ২৬, সিরামিকখাতে ১৭, চামড়াশিল্পে ৪, ইটভাটা ১১, জাহাজভাঙা ৭, চা-শ্রমিক ১, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুতকেন্দ্রে ৩ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়।

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮)এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এ উল্লেখিত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট নির্দেশনার যথাযথ প্রয়োগের অভাব, হতাহতের ঘটনা বাড়ছে। শ্রমিকের মৃত্যুর দায় সরকার ও কি এড়াতে পারে?

প্রডাকশন শ্রমিকদের পিসরেট বৃদ্ধির দাবি



নারায়ণগঞ্জে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত

সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী প্রডাকশন শ্রমিকদের পিসরেট বৃদ্ধির দাবিতে ২৪ ডিসেম্বর '২৩ ফকির নিটওয়্যার লিমিটেডের শ্রমিকরা নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ ও শহরে মিছিল অনুষ্ঠিত করে।

সমাবেশে কারখানার শ্রমিক সাজুর সভাপতিতে বক্তব্য রাখেন গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি সেলিম মাহমুদ সাধারণ, সম্পাদক সাইফুল ইসলাম শরীফ, সিদ্ধিরগঞ্জ থানার সভাপতি রুহুল আমিন সোহাগ, তল্লা আঞ্চলিক শাখার সংগঠক কামাল হোসেন, কাঁচপুর শিল্পাঞ্চল শাখার সহসভাপতি আনোয়ার খান প্রমুখ।

নারী নির্যাতন বন্ধ, অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান

সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের ৪০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

৫ জানুয়ারি '২৪ মহিলা ফোরামের ৪০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি প্রকৌশলী শম্পা বসু এবং সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট দিলরুবা নূরী এক বিবৃতিতে সংগঠনের সকল নেতা-কর্মী, সমর্থক-শুভানুধ্যায়ীদের এবং নারীসমাজসহ দেশবাসীকে বিপ্রবী শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সমাজে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শক্তিশালী করে শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালের ৫ জানুয়ারি বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর নারী সংগঠন হিসেবে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের আত্মপ্রকাশ। মহিলা ফোরাম মনে করে, সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ছাড়া গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব না। স্বাধীনতার ৫২ বছর পরেও নারীরা বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার। একদিকে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কারণে ধনী-গরিব বৈষম্য অপরদিকে পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার কারণে নারী হিসেবে দ্বৈত শোষণের শিকার।

পেশাজীবী, শ্রমজীবী নারীদের অবস্থা আরও করুণ। মজুরি বৈষম্য, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, মাতৃত্বকালীন ছুটির অধিকার থেকে বঞ্চিত। পর্যাপ্ত ডে-কেয়ার সেন্টার না থাকা নারীদের কর্মজীবনকে দুঃসহ করে তুলছে। প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে নারী-শিশুনির্যাতন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিচার বা শাস্তি হয় না বললেই চলে। গণতন্ত্র ও সভ্যতার স্বার্থে, উন্নত রুচিবোধ ও সংস্কৃতি চেতনার আলোকে নারী-পুরুষের সৌন্দর্যমণ্ডিত জীবন ও যৌথ কর্মপ্রয়াসের বিকল্প নেই। সমাজের অগ্রগতি ও প্রগতির স্বার্থে, সুস্থ নিরাপদ জীবনযাপন ও পরবর্তী প্রজন্মের মনুষ্যত্ব নিয়ে বেড়ে উঠার স্বার্থে নারী-পুরুষের মধ্যকার অসাম্য-বৈষম্য বিলোপ আজ সময়ের দাবি। সেই দাবি পূরণের লক্ষ্যে সকল প্রকার অসুস্থ মানসিকতা, প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যানধারণা, ভোগবাদী প্রবণতা দূর করার জন্য একটি শক্তিশালী নারী সংগঠন, নারী মুক্তি আন্দোলন ও নারী-পুরুষের মিলিতভাবে সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রাম বেগবান করা অনিবার্য। নেতৃত্বদ প্রতীষ্টাবার্ষিকীতে দেশবাসীর প্রতি মহিলা ফোরামের সংগ্রামকে সার্বিক সহযোগিতার আহ্বান জানান।



৫ জানুয়ারী সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও জেলা আহবায়ক ইশরাত জাহান লিপির সভাপতিত্বে এবং ছাত্র ফ্রন্ট জেলা শাখার সংগঠক জিহানুল হক জোহার সঞ্চালনায় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শীতর্ত মানুষের পাশে বাসদ



সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ



জয়পুরহাট জেলা শাখার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ



দিনাজপুর জেলা শাখার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ



গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ



নওগাঁ জেলা শাখার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ



নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ নারায়ণগঞ্জ জেলা আহ্বায়ক কমরেড নিখিল দাস ও সদস্যসচিব আবুনাসিম খান বিপ্লব ১৪ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বাসদ নারায়ণগঞ্জ মহানগর ১৮ নং ওয়ার্ড শাখার নেতা কমরেড সিরাজুল ইসলাম খোকনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়স্বজনসহ শোকাহত সকলের প্রাত আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন।



ফিলিস্তিনে গণহত্যা বন্ধ কর, ইসরায়েলি দখল মুক্ত কর



১৫ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ ইসরায়েলি দখলদারিত্ব গণহত্যা ও জুলুমে ক্ষুব্ধ। বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে এই সমাবেশ তাই দাবি করছে

১. ফিলিস্তিনিদের উপর দখলদার ইসরায়েলি নারকীয় আত্মসান ও গণহত্যা অনতিবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

২. ইসরায়েলি দখলদারিত্ব ও নিয়ন্ত্রণের পরিপূর্ণ অবসান ঘটিয়ে ফিলিস্তিনিদের উভয় অংশের মানুষের জানমাল, জীবন-জীবিকা, নিরাপত্তা ও পরিপূর্ণ মানবাধিকার এবং মর্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিভিন্ন চুক্তি প্রস্তাব ও শর্ত মানদণ্ড অনুযায়ী স্বাধীন ও সার্বভৌম

প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. আমাদের মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে বরাবরই ফিলিস্তিনি জনগণের সাথে আমাদের অঙ্গীকারাবদ্ধ সম্পর্ক অথচ আমরা দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি যে, বাংলাদেশ সরকার ইসরায়েলের প্রতি নমনীয়ভাবে নিয়ে পাসপোর্ট সংশোধন করেছে। এছাড়া ইসরায়েলের কাছ থেকে সরকার জননিপীড়নের প্রযুক্তি ক্রয় করেছে বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আমরা এর নিন্দা করি এবং অবিলম্বে ফিলিস্তিনি জনগণের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে বাংলাদেশ সরকারের দৃঢ় ও স্বচ্ছ ভূমিকা নেবার দাবি জানাই। এই সমাবেশ ফিলিস্তিনিসহ বিশ্বের সকল প্রান্তে সাম্রাজ্যবাদী আত্মসান দখলদারিত্ব এবং শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনগণের লড়াইয়ের সাথে আবারও সংহতি জানাচ্ছি।

ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক বিপ্লবী মাস্টার দা সূর্যসেনের ৯০তম ফাঁসি দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন



ফিলিস্তিনে গণহত্যা বন্ধ কর, ইসরায়েলি দখল মুক্ত কর

ফিলিস্তিন সংহতি কমিটি, বাংলাদেশ

শেষ পৃষ্ঠার পর

ফিলিস্তিন সংহতি কমিটি, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে ঢাকা জাতীয় জাদুঘরের সামনে ২৯ ডিসেম্বর ফিলিস্তিন সংহতি সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং অধ্যাপক ডা. হারুন-আর-রশিদের সঞ্চালনায় সমাবেশে ঘোষণাপত্র পাঠ করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ।

এই সমাবেশ ও মিছিলে দেশের বামপন্থি রাজনৈতিক দল, প্রগতিশীল লেখক-শিল্পী, বুদ্ধিজীবী এবং নারী-শিশুসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। ছিলেন ঢাকায় অবস্থানরত দুজন ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থীও।

ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত ইউসেফ রামাদানের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন চৌধুরী মুফাদ আহমেদ। সমাবেশের শুরুতে সাংস্কৃতিক পর্বে কবিতা আবৃত্তি করেন হাসান ফকরী ও বেলায়েত হোসেন; গান পরিবেশন করে চারণ সাংস্কৃতি কেন্দ্র ও বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। ‘বটতলা’ পরিবেশন করে ‘ফুলগুলো কোথায় গেল?’ শীর্ষক নাটক। এর পর সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে শাহবাগ থেকে মিছিল নিয়ে সায়েন্স ল্যাব, নীলক্ষেত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি ঘুরে শহিদ মিনারে শেষ হয়।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, ফিলিস্তিনে যা চলছে তা যুদ্ধ নয়, সেটা হচ্ছে অতি নির্মম-নৃশংস, বর্বরোচিত গণহত্যা। পশ্চিমা গণমাধ্যম এটাকে যুদ্ধ বলে চালানোর চেষ্টা করছিল। এটা হচ্ছে একটা রাষ্ট্র কর্তৃক আরেকটা জনগোষ্ঠীর উপরে বর্বর হামলা। সে জনগোষ্ঠী তাদের নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে, তাদের বসবাসের অধিকার হারাচ্ছে। তাদের ভূমির অধিকাংশ ইতিমধ্যে ইসরায়েল দখলে নিয়ে নিয়েছে। জনগোষ্ঠীর উপর তারা যেভাবে হামলা চালাচ্ছে তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। আর ইসরায়েলকে নির্মমতা চালাতে শক্তি জোগাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। গণহত্যা আমরা ১৯৭১ সালে দেখেছি, এখন ফিলিস্তিনের মানুষ সেটার শিকার।

তিনি বলেন, দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই ইসরায়েলিদের পূর্বপুরুষরা হিটলারের যে নৃশংস বর্বরতা দেখেছে, যে হলোকাস্ট দেখেছে সেটা

তারা ভুলে গেছে এবং সেই হলোকাস্ট তারা এখন ফিলিস্তিনিদের উপরেই চালাচ্ছে। এর নিন্দা আমরা করব কিন্তু আমরা জানব এর মীমাংসা কেবল নিন্দা দিয়ে হবে না। প্রত্যেকটা দেশেই মানুষকে সামাজিক বিপ্লবের দিকে যেতে হবে। সেই সামাজিক বিপ্লব যদি প্রত্যেকটা দেশে ঘটে তাহলেই পুঁজিবাদের পতন হবে, সাম্রাজ্যবাদের পতন হবে এবং তখন দেখা যাবে ইসরায়েল বলে কোনো রাষ্ট্র নেই। বর্ণবাদী কোনো রাষ্ট্র নেই। প্রতিবেশী ভারত যে হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র গড়ছে, সেটাও নেই।

তিনি বলেন, মধ্যযুগে এই অঞ্চলে ধর্মযুদ্ধ হয়েছিল মুসলমানদের সঙ্গে খ্রিস্টানদের। এখন যে যুদ্ধ হচ্ছে, সেই যুদ্ধ মুক্তি সংগ্রামের। এই যুদ্ধে ফিলিস্তিনের পাশে কেবল মুসলমানরা নয়, অন্যান্য ধর্মালম্বী মানুষেরাও আছেন। ফিলিস্তিনের মানুষদের যে সংগ্রাম সেই সংগ্রাম আমাদেরও সংগ্রাম। সেই সংগ্রাম পৃথিবীর সমস্ত মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রাম।

ফিলিস্তিন সংহতি সমাবেশের ঘোষণা

ইজরায়েলি আগ্রাসন ও গণহত্যা বন্ধ কর, ফিলিস্তিন মুক্ত কর এই স্লোগান দিয়ে আমরা আজ এখানে সমবেত হয়েছি। বাংলাদেশের মানুষের পক্ষ থেকে এই সংহতি সমাবেশ ও র্যালি একচ্ছত্র জায়নবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের জন্য ভূমি সন্তান আরব ফিলিস্তিনিদের গত ৭৫ বছর ধরে হত্যা নির্যাতন বাস্তবতা থেকে উচ্ছেদ ও তাদের ভূমি দখলের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। আমরা একই সঙ্গে জর্ডান নদী থেকে ভূমধ্যসাগর ফিলিস্তিনে আসবেই স্বাধীনতার ভোর এই প্রোগান নিয়ে ফিলিস্তিনি দীর্ঘ অসম কিন্তু অক্লান্ত মুক্তি সংগ্রামের সাথে সংহতি জানাচ্ছি। সেই সাথে যারা ইসরায়েলের এইসব অমানবিক ফ্যাসিবাদী নৃশংস উপনিবেশিক দখল ও হত্যাজঙ্ককে অর্থনৈতিক, সামরিক ও কূটনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে যাচ্ছে আমরা তাদের সেই সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্য, কানাডা-অস্ট্রেলিয়াসহ ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর ভূমিকার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। অধিকাংশ ক্ষমতাধার আরব ও মুসলিম রাষ্ট্রগুলো যেভাবে এই বর্বরতার মুখে দর্শক-শ্রোতার মতো ভূমিকা নিচ্ছে আমরা তার পরিবর্তনের জোর আহ্বান জানাচ্ছি। সেই সাথে যেসব দেশ ইসরায়েলের বর্বরতার বিরুদ্ধে

ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক বিপ্লবী মাস্টার দা সূর্যসেনের ৯০তম ফাঁসি দিবসে জে.এম.সেন হল আবক্ষ ভাস্কর্যে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, চট্টগ্রাম জেলা শাখার পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়

ফাঁসির পূর্বে মাস্টারদা সূর্য সেনের লোখা চিঠি

‘আমার বিদায় বাণী—আদর্শ ও একতা। ফাঁসির রজ্জু আমার মাথার ওপর ঝুলছে। মৃত্যু আমার দরজায় করাঘাত করছে। মন আমার অসীমের পানে ধেয়ে চলেছে। এই তো আমার সাধনার সময়। এই তো আমার মৃত্যুকে বন্ধুর মতো আলিঙ্গন করার সময়, হারানো দিনগুলোকে নতুন করে স্মরণ করার সময়।

আমার ভাই-বোনেরা, তোমাদের সবার উদ্দেশ্যে বলছি—আমার এই বৈচিত্র্যহীন জীবনের একঘেয়েমিকে তোমরা ভেঙে দাও, আমাকে উৎসাহ দাও। এই আনন্দময়, পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমি তোমাদের জন্যে কী রেখে গেলাম? শুধু একটিমাত্র জিনিস, তা হল আমার স্বপ্ন। একটি সোনালী স্বপ্ন। স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন। এক শুভ মুহূর্তে আমি প্রথম এই স্বপ্ন দেখেছিলাম। উৎসাহ ভরে সারা জীবন তার পেছনে উন্মত্তের মতো ছুটেছিলাম। জানি না, এই স্বপ্নকে আমি কতটুকু সফল করতে পেরেছি।

আমার মৃত্যুর শীতল স্পর্শ যদি তোমাদের মনকে এতটুকু স্পর্শ করে, তবে আমার এই

সাধনাকে তোমরা তোমাদের অনুগামীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিও যেমন আমি তোমাদের দিয়েছিলাম। বন্ধুগণ, এগিয়ে চলো। কখনো পিছিয়ে যেও না। দাসত্বের দিন চলে যাচ্ছে। স্বাধীনতার লগ্ন আসন্ন। ওঠো, জাগো। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিলের চট্টগ্রাম-বিদ্রোহের কথা কোনদিনও ভুলো না। জালালাবাদ, জুলধা, চন্দননগর ও ধলঘাট-এর সংগ্রামের কথা সব সময়েই মনে রেখো। যে সব বীর সৈনিক স্বাধীনতা-সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের নাম মনের গভীরে রক্তাক্ষরে লিখে রেখো।

আমার একান্ত অনুরোধ, এই সংগঠনে যেন বিভেদ না আসে। জেলের বাইরে এবং ভেতরে সবার জন্য আমার আশীর্বাদ ও ভালোবাসা রইল। বিদায়! বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক! বন্দে মাতরম! চট্টগ্রাম জেল,

১১ই জানুয়ারি, ১৯৩৪

সন্ধ্যা ৭টা

স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছে এই সমাবেশ থেকে আমরা তাদের প্রশংসা করছি। এইসঙ্গে গণতান্ত্রিক সংস্কারের মাধ্যমে জাতিসংঘকে অর্থপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার দাবি জানাই।

সারাবিশ্বে ধর্ম-জাতি, লিঙ্গ-বর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষের প্রতিবাদ ও সংহতি কর্মসূচি এই সমাবেশে বিশ্বের সবচাইতে আশা ব্যাঞ্জক ঘটনা। রাষ্ট্রের সাথে জনগণের পার্থক্য ও এখানে স্পষ্ট হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করছি যে, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো ইসরায়েলের পক্ষে অবস্থান নিলেও সেসব দেশের সর্বস্তরের মানুষ নিপীড়িত ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য রাস্তায় নেমে এসেছেন। আমরা আরও লক্ষ্য করছি যে, একদিকে যেমন অনেক মুসলিম প্রধান দেশ ফিলিস্তিনিদের প্রতি সক্রিয়ভাবে দাঁড়াচ্ছে না আবার বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে খ্রিস্টান-ইহুদিসহ বিভিন্ন ধর্ম ও মতাবলম্বীরা ফিলিস্তিনিদের পক্ষে ইসরায়েলি দখলদারিত্বের প্রতিবাদে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এগুলো এটাই স্পষ্ট করে যে, ফিলিস্তিনি জনগণের উপর ইসরায়েলি জুলুম গণহত্যা দখলদারিত্ব আর তার বিরুদ্ধে লড়াই কোন ধর্মীয় বিষয় নয় এ লড়াই সাম্রাজ্যবাদী-ফ্যাসিবাদী দখলদার জালেম অপশক্তির বিরুদ্ধে সকল ধর্ম-বর্ণের মুক্তিকামী মজলুম বিশ্ব মানবতার লড়াই। আমরা এর অংশ হিসেবেই আজ এখানে সমবেত হয়েছি।

১৯৪৮ সালে জায়নবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রায় সাড়ে সাত লাখ ফিলিস্তিনবাসীকে বাস্তবায়িত, ২৩ হাজার ফিলিস্তিনিকে হত্যা এবং ৫৩০টির মতো গ্রাম সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়। ফিলিস্তিন দখল করার জন্য সম্মিলিত এই ঘটনাগুলিকে ফিলিস্তিনিরা ‘নাকবা’ ধ্বংসযজ্ঞ বলে থাকে। ভূমধ্যসাগর সংলগ্ন ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের অপর অংশ গাজায় ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুরা আশ্রয় নিয়েছিল। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরায়েল সেই গাজা দখল করে। বর্তমানে গাজা প্যালেস্টাইনের অংশ হলেও আক্ষরিক অর্থেই ইসরায়েল কর্তৃক অপরুদ্ধ। আন্তর্জাতিকভাবে গাজাকে এখন বলা হয় বিশ্বের বৃহত্তম উন্মুক্ত কারাগার।

প্রতিবছর ৭ অক্টোবর থেকে দখলদার ইসরায়েলের ঘৃণ্য মানসিকতা বিরোধী যুদ্ধ অপরাধের নতুন পর্যায়ে নজিরবিহীন গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ রূপে হাজির হয়েছে যা আজ (২৯ ডিসেম্বর ২০২৩) ৮৪ দিন ধরে অব্যাহত রয়েছে এই সময় ইজরায়েলি দখলদার বাহিনী ২১ হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করেছে।

এই সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। নিহতদের মধ্যে ৮ হাজারের বেশি শিশু এবং ৬ হাজারের বেশি নারী। অনুমান করা হচ্ছে আরও ৮ হাজার মানুষ ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে। আন্তর্জাতিক কোনও আইন বিধি ইসরায়েল মান্য করছে না। প্রকৃতপক্ষে ইসরায়েল গাজাকে আন্তর্জাতিক আইনের কবরস্থানে পরিণত করেছে। কিন্তু ইসরায়েল ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে হত্যা জুলুম করে যাচ্ছে ১৯৪৮ সাল থেকে আর হামাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৮৭ সালে। এই দুই সময়ের মধ্যেই দখলদারদের হাতে প্রায় ৫০ হাজার ফিলিস্তিনি খুন হয়েছে। কাজেই এসব অজুহাত কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

এই পর্বে হামলার শুরু থেকেই ইসরায়েল ঘোষণা দিয়ে গাজার অধিবাসীদের জন্য খাদ্য-পানি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি চিকিৎসা সামগ্রী প্রবৃত্তিরমতো জীবন রক্ষাকারী সকল কিছুর পথ বন্ধ করে দেয়। বোমাবর্ষণে ৬০ শতাংশ বসতবাড়ি পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে। সুপরিকল্পিতভাবে গাজায় হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণসহ মসজিদ ও গির্জা স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাদুঘর ও চিড়িয়াখানা, নাট্যশালা, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ধ্বংস করা হয়েছে। পরিকল্পিতভাবে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে দেশি-বিদেশি সাংবাদিক, চিকিৎসক ও ত্রাণকর্মী-উদ্ধারকর্মী, ডাক্তার-নার্স, চিকিৎসাকর্মী, শিক্ষক-গবেষক।

শুধু তাই জাতিসংঘের ত্রাণকর্মীদেরও হত্যা করা হচ্ছে। জাতিসংঘ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ইউনেসফ, ইউএন উইমেন, বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি প্যালেস্টাইনের উদ্বাস্তুদের জন্য নিয়োজিত জাতিসংঘের সংস্থাগুলো ও তার কর্মকর্তাদের কাজ করতে দেয়া হচ্ছে না। বরং তাদের ১৪২ জন খুন করা হয়েছে যা নজিরবিহীন। বিপুলসংখ্যক নারী ও শিশুসহ আবাহ গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ অবরোধ পানি ও খাদ্যভাবে চিকিৎসা ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন রোগব্যধির বিস্তার ইত্যাদি দিয়ে ইসরায়েল গাজাকে পৃথিবীর বুকে নরক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আমরা দৃঢ়কণ্ঠে বলতে চাই সাম্রাজ্যবাদ মদদপুষ্ট ইসরায়েলে আগ্রাসন দখল গণহত্যা এবং অব্যাহত জুলুমের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতিরোধ অবশ্যই ন্যায্যসঙ্গত ও যৌক্তিক।

এরপর পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৩

পুঁজিবাদী শোষণ-ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন হটাও, বাম গণতান্ত্রিক বিকল্প গড়

বাম গণতান্ত্রিক জোট

ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন, একদলীয় কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থার অবসান, বাম গণতান্ত্রিক বিকল্প গড়ে তোলা, চলমান রাজনৈতিক সংকট দূর করতে একদলীয়, অগ্রহণযোগ্য, জনসমর্থনহীন প্রহসনের নির্বাচনে ঘোষিত সংসদ ভেঙে দিয়ে, তামাশার নির্বাচনে গঠিত সরকারকে পদত্যাগ করে অবিলম্বে নির্বাচনকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন, সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তনসহ নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ, সিভিকিট ভাঙ্গা, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিকল্প বাজার ব্যবস্থা চালু এবং গ্রাম শহরে রেশনিং ব্যবস্থা, ন্যায্যমূল্যে দোকান চালুর দাবিতে ১৮ জানুয়ারি '২৪, সকাল ১১.৩০টায় পুরানা পল্টনস্থ মুক্তিভবনের মৈত্রী মিলনায়তনে বাম গণতান্ত্রিক জোটের সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাম জোটের সমন্বয়ক ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট



পার্টি (সিপিবি)র সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সিপিবি সভাপতি মোহা. শাহ আলম, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-(বাসদ)-এর সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আব্দুস সাত্তার, বাসদ (মার্কসবাদী)'র সমন্বয়ক মাসুদ রানা, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক

মোশেরেফা মিশু ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী।

সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্যে বাম জোট নেতৃবৃন্দ বলেন, আমরা যেসময় উপস্থিত হয়েছি, তখন চালসহ নিত্যপণ্যের উর্ধ্বমূল্যের কারণে বাজার অস্থির। প্রহসনমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে সরকার ক্ষমতায় বসে জনগণকে আতঙ্কিত করার

জন্য বলছে যে, আগামীতে নানা সংকট আসতে পারে। জনসমর্থনহীন সরকার ও গণতন্ত্রহীনতাই এই আশঙ্কার জন্ম দিচ্ছে এবং জিইয়ে রেখেছে।

এই রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক জটিল সংকটের সময়ে আন্দোলনকারী শক্তি হিসাবে বাম গণতান্ত্রিক জোটের পক্ষ থেকে আপনাদের মাধ্যমে বর্তমান পরিস্থিতি ও করণীয় সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য দেশবাসীর সামনে তুলে ধরি।

অবাধ, সুষ্ঠু অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের গণদাবি ও জনমত উপেক্ষা করে ৭ জানুয়ারি ২০২৪, দেশে নির্বাচনের নামে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার একদলীয়, ভাগাভাগীর একতরফা, অভিনব ধরনের এক প্রহসনের নির্বাচন সম্পন্ন করেছে। নির্বাচন নিয়ে দেশে-বিদেশে সমালোচনা, গুরুতর অসঙ্গতি এবং নানামুখী আলোচনার মধ্যেই অবিশ্বাস্যরকম দ্রুততার সাথে সংসদ সদস্যদের শপথ ও মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়েছে। অতীতের স্বেচ্ছাচারী সরকার ও নির্বাচনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সরকার যখন একদলীয় একতরফা এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

ফিলিস্তিনে গণহত্যা বন্ধ কর, ইসরায়েলি দখল মুক্ত কর



গাজায় গণহত্যা বন্ধের দাবিতে ফিলিস্তিন সংহতি কমিটি, বাংলাদেশ এর ঢাকায় সংহতি সমাবেশ ও মিছিল

বিস্তারিত :
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

শ্রমিকশ্রেণির মুক্তির সংগ্রামে কমরেড লেনিন আজও পথপ্রদর্শক



লেনিনের মৃত্যুশতবার্ষিকী উপলক্ষে বাসদ-এর স্মরণসভা

মহান রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপকার, বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের অন্যতম মহান নেতা ভাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ লেনিনের মৃত্যুশতবার্ষিকীতে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর উদ্যোগে ২১ জানুয়ারি সেগুনবাগিচাস্থ ভ্যানগার্ড মিলনায়তনে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক

কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা কমরেড খালেদুজ্জামান, সহকারি সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, সভা পরিচালনা করেন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নিখিল দাস।

নেতৃবৃন্দ বলেন, কমরেড লেনিন ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রথম শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রমিকশ্রেণি রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল ও রাষ্ট্র পরিচালনা এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১